মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং - ২৭২
১৭শ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
এপ্রিল ২০১২ ঈসায়ী

তাসাউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

দক্ষিণ আফ্রিকায় হযরত তুয়ান গুরুর (রঃ) মাজার শরীফ [উপরে]
হযরত বাবা ভান্ডারীর (কঃ) রওজা শরীফ [নীচে]

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম
সূফী সাধক হযরত শেখ ইউসুফ (রঃ)
এর মাজার শরীফের বহির্ভাগ

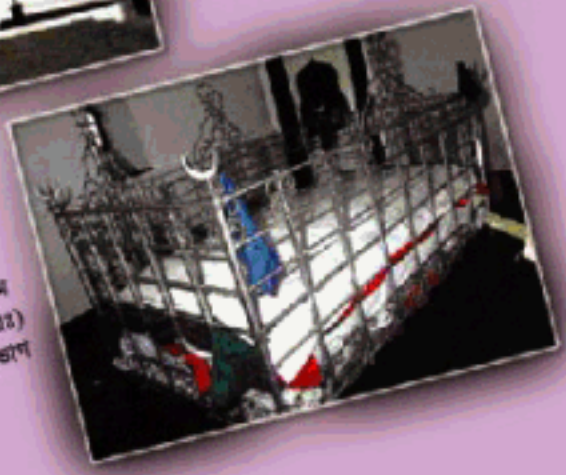

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম
সূফী সাধক হযরত শেখ ইউসুফ (রঃ)
এর মাজার শরীফের অভ্যন্তরভাগ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্‌ষ্টিটিউটে মাইজভান্ডারী একাডেমীর দুই দিন ব্যাপী ৩য় আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলন ৯ ও ১০ মার্চ ২০১২ এর ছবি ঃ

৩য় আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনে পতাকা ও বেলুন উত্তোলন করছেন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভান্ডারী, সালাউদ্দিন কাসেম খাঁন, ড. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী।

মাসিক
আলোকধারা
THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল ২০১২ ঈসায়ী
জমাদিউল আউয়াল-জমাদিউস্‌সানী ১৪৩৩ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ ১৪১৮ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক
মোঃ মাহবুব উল আলম

যোগাযোগঃ
লেখা সংক্রান্তঃ ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্তঃ ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৫, সিডিএ, সি/এ (তেতলা) মোমিন রোড,
চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৮৮৫৫

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট এর একটি প্রকাশনা

website : www.sufimaizbhandari. org
e-mail address :
alokdhara@sufimaizbhandari.org
sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ *সম্পাদকীয় :* সূফিবাদী জীবন-চেতনায় বিকশিত হওয়াই বিশ্বশান্তির নির্ভরযোগ্য পন্থা ---------- ২

■ হযরত আকদাছ (কঃ)'র প্রতি রূহানী আকর্ষণই হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)'র বেলায়তী ক্ষমতার উৎস
–ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী ---------- ৩

■ ঐশী প্রেমের অনন্য পথ প্রদর্শক হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)
–জাবেদ-বিন-আলম ---------- ৫

■ মাশুকের দিদার লাভের পথ
–আবু মোহাম্মদ জাফরুল হক মাইজভাণ্ডারী ---------- ৭

■ জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফ্‌হিরে ছুরা এনশেরাহ্
–হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী ---- ৯

■ মাইজভাণ্ডারী দর্শন
–মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ১২

■ ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার ও দাসমুক্তির সংগ্রামে দুই পুরোধা সূফী মনীষা হযরত শেখ ইউসুফ (রঃ) ও হযরত তুয়ান গুরু (রঃ)
–মোঃ মাহবুব উল আলম ---------- ১৫

■ তাসাওউফে ইসলামীর অনুশীলনের অপরিহার্যতা
–মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান ---------- ১৭

■ ইস্কামতের শব্দাবলী ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা
– বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর ---------- ২০

■ আল্লাহ ও তাঁর রসুল মুহাম্মদ (দঃ) এর দৃষ্টিতে ঈমান
–এ.এন.এম. এ. মোমিন ---------- ২৫

■ হযরত যুনাইদ বাগদাদী (রাহ্) এর সূফি দর্শন
–মূলঃ ড. আলী হাসসান আব্দুল কাদের
–অনুবাদ : অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ---------- ২৮

■ আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়
–অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ------- ৩১

■ মুসলিম নেতৃত্ব-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত
–মূলঃ টিমেথি জে. জ্ঞানতি, পি.এইচ.ডি.
–অনুবাদঃ মোঃ গোলাম রসুল ---------- ৩৪

■ মানব স্মৃতি কিভাবে কাজ করে - পর্যালোচনাঃ
–ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ---------- ৩৬

■ নবীদের ইতিহাস
– অনুবাদঃ মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ৪১

■ সংগঠন সংবাদ ---------- ৪৪

সম্পাদকীয়...

সূফিবাদী জীবন-চেতনায় বিকশিত হওয়াই বিশ্বশান্তির নির্ভরযোগ্য পন্থা

সম্প্রতি চট্টগ্রামে মাইজভাণ্ডারী একাডেমী আয়োজিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনে আত্মকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে উঠে আধ্যাত্মবাদ চর্চার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। মানব সমাজ আজ নানাবিধ সংঘাত ও সমস্যায় জর্জরিত। বিভিন্ন ক্ষমতাধর রাষ্ট্র নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে আন্তর্জাতিক পরিসরে সর্বমানবিক স্বার্থ হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে সংঘাতের কারণ সৃষ্টি করছে। এভাবে দেখা যায় যে, ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক সংঘাতই বিশ্বে ধ্বংস ও অশান্তির প্রধান কারণ। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) খাদেমুল ফোকরা হযরত শাহসূফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর সুবিখ্যাত 'বেলায়তে মোতলাকা' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন,"বর্তমানে দেখা যায়, বিশ্ব জাতি-সংঘে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়ই মূল্যবান আলোচ্য বিষয়। তথায় বিশ্বাসজনিত বস্তু বা ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ ঝগড়া বা আলোচ্য বিষয় নাই। যাহারা খোদা মানে এবং যাহারা মানেনা, তাহাদের মতবাদের উপর কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থিত হয় না বা ইহা লইয়া কোন বিরোধ করেনা। বরং যাহা লইয়া ঝগড়া-ফাছাদ দেখা যায়, তাহা নেয়ায়েত বৈষয়িক এবং ধন সঞ্চয় ও বন্টনের প্রাধান্যের বিরোধ।" প্রশ্ন উঠে, এই বিরোধ পরিহারের কিম্বা এ বিরোধ থেকে উত্তরণের পথ কোথায়? মানবতাকে সংঘাতমুক্ত করে বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির উন্মুক্ত মহাসড়ক নির্মাণের দিশা কোথায়? এই জটিল অথচ আবশ্যকীয় বিষয়ের উত্তরও তিনি দিয়েছেন একই গ্রন্থে। তাঁর মতে, সূফি সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণ করতে পারলে মানবতা তার কাংখিত শান্তির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, "বেলায়তে মোতলাকার দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্ব মানবতার জন্য স্রষ্টা অনুমোদিত শান্তি ধারা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ধন সঞ্চয় ও বন্টনের বা ধর্মকে চতুর জনের ব্যবসা রূপ দেবার ফলে যাহারা ধর্ম বিমুখ বা নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, তাহাদের জন্য ইহা একটি উত্তেজনা বিহীন পন্থা এবং এই বেলায়তে মোতলাকা বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণ ধর্ম দিশারী। ইহা ধনতন্ত্র ও নাস্তিকতাবাদের মূল উৎপাটনকারী, ধর্মসাম্য উৎসাহী বিশ্বশান্তির প্রতীক।"

বস্তুতপক্ষে সূফি সম্মেলনে আগত বিজ্ঞ অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের মধ্যে অছিয়ে গাউসুল আ'যমের এই দর্শন ও অভিব্যক্তিই ফুটে উঠেছে। মানুষকে প্রথমে উঠতে হবে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে। তাকে নীতিগতভাবে এবং কার্যকরভাবে স্বীকার করতে হবে যে, সবাইকে নিয়ে, সবার সাথে মিলে এই পৃথিবীতে বাঁচতে হবে এবং অন্যদেরকেও বাঁচতে দিতে হবে। অন্যথায় মানবতা নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহ ও সংঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে মানুষের কাংখিত শান্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন যে, লোভ-লালসা ও আত্ম কেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে উঠে আত্মসংশোধন করাই সূফিদের দর্শন। আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে সূফিদের অনুসৃত আধাত্মবাদ চর্চার মাধ্যমে চলমান হানাহানি-অশান্তির বিপরীতে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আজকের দিনে সব জাতির সব ধর্মের সব বিশ্বাসের লোকদেরকে একই পতাকার নীচে একই ঘোষণার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করা খুবই কঠিন। কিন্তু সূফিবাদ এক্ষেত্রে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে বিশ্বপ্রেম-মানবপ্রেমের দরোজা উন্মুক্ত করে রেখেছে। সূফিবাদ সার্বজনীন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। ধর্মগত বিভেদের উর্ধ্বে উঠে মানুষে মানুষে মেলবন্ধন গড়ে তোলাই সূফিবাদের মূল কথা। মাইজভাণ্ডারী সূফি দর্শনেরও এটাই মূল কথা এবং এজন্যেই এই চিন্তা ও চেতনা বিশ্বে ক্রমাগত সমাদৃত হচ্ছে।

আমাদের বিশ্বাস, এই সার্বজনীন, বিশ্বজনীন, সর্বমানবিক আবেদন শান্তিকামী মানুষদের অন্তরে আলোড়ন জাগাতে সক্ষম হবে। সারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ধর্মীয় বিশ্বাসে যে শৈথিল্য এসেছে, তার কারণগুলো গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন অনেক মনীষী। তাঁদের মতে, অতিমাত্রায় স্বার্থকেন্দ্রিকতা ও ভোগস্পৃহা মানুষের ভেতরের সর্বগ্রাসী প্রবণতাকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। এ প্রবণতার রাশ টেনে ধরতে পারে একমাত্র আত্ম সংযম। সূফিবাদ এই আত্ম সংযমেরই শিক্ষা দেয়। সূফিবাদ ইসলামের জীবন দর্শনের নির্যাস। সকল নবী-রসূলের মিশন ছিল দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের মুক্তি অর্জনের পথ প্রদর্শন করা। মানুষের শরীর, মন, চিন্তা ও কর্মের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে উন্নত চরিত্র অর্জনের পথে মানুষকে চালিত ও ধাবিত করাই ছিল সকল নবী-রাসূল ও সূফিদের লক্ষ্য। সূফিবাদ মানুষকে আল্লাহ ও কল্যাণের দিকে ধাবিত করে। সূফিবাদের এ শিক্ষা সমাজে প্রসারিত হোক।

এ মাসে (২২ চৈত্র) গাউসুল আশেকীন শাহসূফি হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) পবিত্র ওরশ শরীফ। সারাদেশ থেকে অগণিত আশেক-ভক্ত ইতোমধ্যে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে হাজির হয়েছেন। আমরা তাঁদেরকে খোশ-আমদেদ জানাই। হযরত কেবলা আলমের (কঃ) ভাষায় "আলমে আরওয়ায় ছায়েরকারী" এই মহান হাস্তির নজরে করম আমাদের উপর বর্ষিত হোক, এই-ই একান্ত কামনা।

হযরত আকদাছ (কঃ)'র প্রতি রূহানী আকর্ষণই হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)'র বেলায়তী ক্ষমতার উৎস

● ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী ●

বিল বেরাছত গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা শাহসূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে হযরত গাউসুল আ'যম মাওলানা শাহসূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ মহান ওলী তাঁর জীবনকে ইসলামের সত্যিকার মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলীতে বিকশিত করেন। হযরত মাওলানা শাহসূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হযরত বাবা ভাণ্ডারী নামেই সমধিক সুপরিচিত।

তাঁর জন্ম ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারী মোতাবেক ২৭ আশ্বিন ১২৭০ বঙ্গাব্দে। শৈশবকাল থেকেই হযরত বাবা ভাণ্ডারী ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ করতেন যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর জন্মের কিছুকাল আগে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হযরত বাবা ভাণ্ডারীর মাতা ছাহেবাকে বলেছিলেন, 'আপনি পীরানে পীর ছাহেবের মা' (ওলীদের ওলীর মা)। হযরত বাবা ভাণ্ডারী ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁর পিতা-মাতা এ স্বর্গীয় দানের জন্য আল্লাহ তা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র মহান বাণী বাস্তবায়নের জন্য দোয়া কামনা করেন।

জন্মের সাত দিন পর হযরত বাবা ভাণ্ডারীকে হযরত আকদাছ (কঃ)'র সমীপে আনা হয়। হযরত আকদাছ (কঃ) শিশু বাবা ভাণ্ডারীকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন, "এই শিশুটি আমার বাগানের গোলাপ ফুল। শিশুটির চেহারায় হযরত ইউসুফ (আঃ)'র বর্ণ ও সৌন্দর্য প্রতিভাত হচ্ছে। তাঁর যত্ন নিও। আমি তাঁর নাম গোলামুর রহমান রাখলাম।" হযরত বাবা ভাণ্ডারীর জন্মের পর থেকে তাঁর পিতা-মাতার পরিবারের দারুন উন্নতি হয় এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসে। সম্ভবতঃ হযরত বাবা ভাণ্ডারী যে আল্লাহ তা'লার অনন্ত আশীর্বাদের প্রতীক এটা তার প্রাথমিক প্রতিফলন।

শৈশবকাল থেকেই হযরত বাবা ভাণ্ডারী নামাজ, রোজা, কুরআন তেলাওয়াত এবং হাদীস চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। হযরত আকদাছ (কঃ) তাঁকে কুরআন তেলাওয়াতের প্রথম ছবক বা পাঠ দেন। হযরত বাবা ভাণ্ডারী একটি স্থানীয় মক্তবে প্রথমে পাঠ গ্রহণ শুরু করেন এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রাম সরকারী মাদ্রাসায় ধর্মশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দেন এবং কুরআন ও হাদীসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শৈশবকাল থেকেই হযরত বাবা ভাণ্ডারী হযরত আকদাছ (কঃ)'র সম্মুখে উপস্থিত থাকতে পছন্দ করতেন। কোন কোন সময় সারা রাত হযরত বাবা ভাণ্ডারী হযরত আকদাছ (কঃ)'র সামনে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর তাঁর পিতামাতা তাঁকে তাঁদের কাছে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে গেলেও সুযোগ পাওয়া মাত্র তিনি হযরত আকদাছ (কঃ)'র খেদমতে হাজির হতেন। হযরত আকদাছ (কঃ)'র সান্নিধ্যে থেকে হযরত বাবা ভাণ্ডারী সর্বোচ্চ বেলায়তী ক্ষমতা অর্জনে সমর্থ হন। ছোট বেলা থেকে হযরত বাবা ভাণ্ডারী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। হযরত বাবা ভাণ্ডারী যখন মাঠে গরু চরাতে যেতেন তখন তিনি বলতেন, "কারো ফসল নষ্ট করিস্ না।"

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর জন্মের কিছুকাল আগে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হযরত বাবা ভাণ্ডারীর মাতা ছাহেবাকে বলেছিলেন, 'আপনি পীরানে পীর ছাহেবের মা' (ওলীদের ওলীর মা)। হযরত বাবা ভাণ্ডারী ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁর পিতা-মাতা এ স্বর্গীয় দানের জন্য আল্লাহ তা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র মহান বাণী বাস্তবায়নের জন্য দোয়া কামনা করেন। জন্মের সাত দিন পর হযরত বাবা ভাণ্ডারীকে হযরত আকদাছ (কঃ)'র সমীপে আনা হয়। হযরত আকদাছ (কঃ) শিশু বাবা ভাণ্ডারীকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন, "এই শিশুটি আমার বাগানের গোলাপ ফুল। শিশুটির চেহারায় হযরত ইউসুফ (আঃ)'র বর্ণ ও সৌন্দর্য প্রতিভাত হচ্ছে। তাঁর যত্ন নিও। আমি তাঁর নাম গোলামুর রহমান রাখলাম।"

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর এ নির্দেশ গরু-ছাগল অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। পশু-পাখীরা তাঁর কথা শুনত। এটা

নিঃসন্দেহে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর শ্রেষ্ঠ বেলায়তী ক্ষমতার নিদর্শন।

হযরত বাবা ভাণ্ডারী প্রায়শঃ রোজা রাখতেন। গভীর রাতে মোরাকাবা- মোশাহেদা করার জন্য তিনি মসজিদে যেতেন। ২৩ বছর বয়সে হযরত বাবা ভাণ্ডারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডে তিনি মনোনিবেশ করতে পারলেন না। ক্রমান্বয়ে তিনি খোদার রহস্যালোকে অবগাহন করে স্রষ্টার নৈকট্য লাভে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। খোদার রহস্য উপলব্ধি করার জন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড ও সেয়াং পাহাড়ের গভীর অরণ্যে এবং কুমিরা ও ফৌজদারহাটে বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে ভ্রমণ করে কাটালেন মাসের পর মাস। আত্মস্থ করলেন খোদায়ী রহস্য। লাভ করলেন বেলায়তের সর্বোচ্চ মকাম।

মানবতার কল্যাণে, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ লাঘবে প্রকাশ করলেন অসংখ্য অবিশ্বাস্য কারামত। পরিশুদ্ধ করলেন মানুষকে, আলোকিত করলেন মানবের অপরিচ্ছন্ন আত্মাকে, খোদার নৈকট্য লাভে ধন্য করলেন শত পাপী-তাপী দিশেহারা মানবতাকে। এ মহান ওলী সকলকে শোক-সাগরে, ভাসিয়ে ৭১ বছর বয়সে ১৯৩৭ সালের ৫ এপ্রিল মোতাবেক ২২ চৈত্র, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে পরপারে পদার্পণ করেন। (ইন্নালিল্লাহে---রাজিউন)। ভাবের আবেশে ভক্তির পরশে আশেক প্রবর বাবা ভাণ্ডারীকে উদ্দেশ্য করে গেয়ে উঠে পান প্রাণের স্পর্শে নিম্নোক্ত ছন্দে–

"এমন মোহন রূপের মুরতি, নুরানী বানাতে জান,
নিজের রূপেতে মজিয়া প্রেমেতে, গোপনে ধরিয়া টান।
রূপের আড়ালে ইশারা দিয়া, সংসারী লোকেরে বৈরাগী করিয়া
গহন কাননে নদীর পুলিনে, আশাতে ঘুরাচছ কেন?
দূরেতে থাকিয়া বাঁশিটি ফুঁকিয়া, জন্ম আর জীবন ত্রিধারা রচিয়া
মায়ার জগতে থাকিয়া গোপেতে, দেখাও মহিমা শান।
সাধক তপসী দরবেশ উদাসী, তোমাতে ডুবিতে ভাল যে বাসি
ত্যাজিলাম সকল হইয়া পাগল, শুনিয়া বাঁশির তান।
গুরুজী বলেছে হৃদয় দেশে, নেহার করিতে প্রেমের আবেশে
দেখিবে কালা হৃদয়ে বসে, ফুটিবে যবে জ্ঞান।
আসিয়া জগতে অবোধ আশেক, স্বপনে মজি জীবন বিফল
বাঁচিতে পারিবে গুরুজী করিলে, তাহারে করুণা দান।"

হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)'র ফয়েজ-বরকত-রহমত আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক। আমিন!
বেহুরমতে সাইয়েদিল মোরছালিন।

সূফি উদ্ধৃতি

■ যারা দুনিয়াকে শুধু একটি আমানতের মালের মত মনে করেন, তারা প্রয়োজন কালে অনায়াসে ইহা আমানতের মালিকের হাতে সোপর্দ করে চলে যেতে পারেন। তাদের মনে কোনরূপ দুঃখ অশান্তির সৃষ্টি হয় না।

■ যে পার্থিব গৃহকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে ভগ্নস্তুপের উপর পারলৌকিক সৌধ রচনা করে, আর পার্থিব মোহাবিষ্ট হয়ে পারলৌকিক সৌধ ভেঙ্গে তার উপর পার্থিব প্রাসাদ রচনায় নিয়োজিত হয় না, মূলতঃ সে লোকই হল প্রকৃত বুদ্ধিমান।

–হযরত হাসান বসরী (রাহ্)

■ যার আয়ু শুধু রূহ ও আত্মার উপর নির্ভরশীল, রূহ বা আত্মার বিদায় গ্রহণের সাথে সাথে তার আয়ু শেষ হয়– সে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু যার আয়ু বা জীবন আল্লাহ তা'লার উপর নির্ভরশীল, তার কখনও মৃত্যু ঘটে না বরং সে অপ্রকৃত যিন্দেগী থেকে প্রকৃত যিন্দেগী অর্জন করে মাত্র।

–হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাহ্)

■ আমি কখনও দুনিয়াদারের কাছে বসা পছন্দ করি না এবং তাদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করা ভালবাসি না।

■ সন্দেহজনক বস্তু থেকে পরহেজ করা ও অন্তরকে সদা নিয়ন্ত্রণে রাখাই পরহেজগারী।

–হযরত বিশর হাফী (রাহ্)

ঐশী প্রেমের অনন্য পথ প্রদর্শক হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)

● জাবেদ-বিন-আলম ●

॥ ১ ॥

গাউসুল আজম শাহসুফি হযরত গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা (কঃ) আধ্যাত্মিক সাধনার একটি স্তরে পাহাড়, জঙ্গল, বন, বাদাড়ে পরিভ্রমণ করেছেন। জন মানবহীন শ্বাপদসংকুল এসব ভয়াল পথ পরিভ্রমণকালে তিনি একবার দেয়াং পাহাড়েও দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। দেয়াং পাহাড়ে যাত্রা পথে হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদ, ধলই এবং মির্জাপুর গ্রামে পৌঁছে আউন্দর দীঘির পাড়ে উপনীত হন। উক্ত দীঘির কর্দমাক্ত জলে স্নান করে পশ্চিম পাড়ে উপবেশন করেন। তিনি দীঘির পাড়ে উপস্থিত আমির আলী সারাংকে বললেন, 'মামু ওজু বানিয়ে হজ্ব করে নাকি?' বর্ণিত ঘটনার কিছুদিন পর শফর আলী তালুকদার নামের এক ব্যক্তি দীঘিটি খনন করে পশ্চিম পাড়ে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং একই বছর আমির আলী সারাং মক্কা-মদীনা শরীফে গমন করে হজ্ব সম্পন্ন করেন। দেয়াং পাহাড় অভিমুখে যাত্রাকালে তিনি হাটহাজারী সদরে পৌঁছেন। এক পর্যায়ে তিনি হাটহাজারী স্কুলের পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে পড়েন। সেখানে তাঁর অনুগামী ভক্ত মওলানা আবদুল গণিকে ওজু করতে নির্দেশ দেন। বাবা ভাণ্ডারী কেবলার নির্দেশ মত মওলানা সাহেব ওজু করা শুরু করলেন। কিন্তু বাবা ভাণ্ডারী কেবলা মওলানা আবদুল গণিকে তিরস্কার করে ওজু শিক্ষা দিতে লাগলেন। এস্থান থেকে বাবাজান কেবলা কাবা মওলানা সাহেবকে বিদায় দেন। উল্লেখ্য যে পরবর্তী সময়ে পুকুর পাড়ে উক্ত স্থানে স্কুলের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে উক্ত মসজিদ উপজেলা সদর জামে মসজিদের মর্যাদা অর্জন করেছে।

উপর্যুক্ত ঘটনা দুটির মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করি যে, বাবা ভাণ্ডারী কেবলার রূপক কালাম এবং স্থান দু'টিতে সাময়িক অবস্থানের কারণে দুটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ বাবা ভাণ্ডারীর পবিত্র কদমের পরশে দীঘি এবং পুকুর পাড়ের উক্ত মাটি চিরকালের জন্য আল্লাহ্‌র জিকিরের নিমিত্তে নির্ধারিত পবিত্র গৃহের মর্যাদা লাভ করে জীবন্ত থেকেছে। এ ধরণের ঘটনার বিষয়ে সুলতানুল হিন্দ, আতায়ে রসুল, গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (কঃ) দিওয়ানে মঈনুদ্দিনে উল্লেখ করেন, "লা মাকান থেকে এশক অবতরণ করে, আশেকগণের হৃদয়ে অবতরণ করে। পেয়ালার তলানি পরিষ্কার কর, কেননা পৃথিবীর বাদশাহ এ মাটির দেহে অবতরণ করে। তখন মাটির সবকিছু প্রাণ লাভ করে, প্রাণের প্রাণ যখন প্রাণে অবতরণ করে।"

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে বাবা ভাণ্ডারী হচ্ছেন এশকের বাদশাহ। তাঁর পবিত্র চরণ স্পর্শে মসজিদের ভিটা হয়ে উক্ত মাটি স্থায়ী প্রাণ পেয়েছে।

॥ ২ ॥

দেয়াং এর পাহাড়ে অবস্থানকালে কাজী মনির আহমদ খাঁ বন্ড স্বর্ণ প্রস্তুতের কানুন শিক্ষার জন্য বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবাকে মাসাধিককাল বিরক্ত করতে লাগলেন। বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) তাঁকে উক্ত খেয়াল পরিত্যাগ করার জন্য কয়েকবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু মনির আহমদ খাঁ সেই খেয়াল পরিত্যাগ না করায় বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম পাহাড়ের একটি গাছের কিছু পাতা এনে মনির আহমদ খাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "তামা গরম করে তার উপর এ পাতার রস ঢেলে দিলে সোনা হয়ে যাবে।" মনির আহমদ খাঁ তামার পয়সা গরম করে বাবা ভাণ্ডারীর নির্দেশ মত পাতার রস ঢেলে দিলে তা প্রকৃত স্বর্ণে পরিণত হয়। এ ঘটনার কিছুদিন পর মনির আহমদ খাঁ আরো তামা সংগ্রহ করে পাহাড় থেকে একই পাতা আনয়ন করে পূর্বের ন্যায় তামা গরম করে পাতার রস ঢালেন। কিন্তু লক্ষ্য করলেন, তামার রং এর কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নি। হয়রান পেরেশান হয়ে মনির আহমদ খাঁ পুনরায় বাবা ভাণ্ডারী কেবলার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনার বর্ণনা দেন। এ সময় বাবা ভাণ্ডারী কেবলা তাঁকে বলেন, "পাতা দ্বারা সোনা হয় না, জবান দ্বারা সোনা হয়।" অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেমের মহান সম্রাট বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা পবিত্র জবান এবং হস্ত স্পর্শের কারণে পাতার মধ্যে স্বর্ণ প্রস্তুতের উপকরণ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তামা স্বর্ণে রূপ নিয়েছে। এ ঘটনায় বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের মাধ্যমে কুন্ ফায়া কুনের জলোয়া পরিদৃষ্ট হয়েছে। দেয়াং পাহাড়ে এবং পাদ দেশে অসংখ্য আউলিয়া কেরাম ফকির-মস্তানের আস্তানা এবং মাজারের অবস্থান আছে। দেয়াং এর পাহাড়ে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ জন্য স্থানও নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশ্য বর্তমানে দেয়াং পাহাড়ের অভ্যন্তরে খৃস্টান মিশনারীদের বিশাল কমপ্লেক্স মরিয়ম আশ্রম গড়ে ওঠেছে। বাবা ভাণ্ডারী কেবলার পবিত্র চরণ ধুলার মর্যাদা প্রাপ্ত দেয়াং

পাহাড়ের বর্তমান অবস্থাকে আমাদের বিধি লিপিই বলতে হয়।

বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম তাঁর পরম প্রিয়তম মুর্শিদ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা কাবার (কঃ) ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণে একযুগ অতিবাহিত করেন। পাহাড়-জঙ্গলে ভ্রমণ শেষে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে স্থায়ীভাবে আগমন করলে লক্ষ্য করেন, হযরত কেবলা কাবা দুনিয়া থেকে তশরীফ উঠিয়ে নিয়েছেন। কার্যতঃ তখন হযরত কেবলার নির্দেশে তিনি 'মাইজভাণ্ডারী সিংহাসনে' স্থলাভিষিক্ত হন। এ বিষয়ে কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা অছিয়র রহমান আল্ ফারুকী চরণদ্বীপী কেবলার (কঃ) জীবনী গ্রন্থে, সাধক কবি হযরত মওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী (রহঃ) এবং মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী (রহঃ) তাঁদের কালামে বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। মাইজভাণ্ডার শরীফের পুরাতন বাড়ীর হুজরায় তিনি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। পরবর্তীতে 'গাউছিয়া রহমান মনজিল' নির্মিত হলে তাঁকে নতুন হুজুরায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। পরবর্তীতে তাঁকে আসনসহ পুরাতন হুজুরা থেকে কাঁধে করে আনয়ন করা হয়। এ দিন ছিল ২৪ জানুয়ারী ১০ মাঘের মহান ওরশ শরীফ। যথারীতি হযরত আকদছ (কঃ)-এর রওজা শরীফের সন্নিকটে আনা হলে তাঁর নির্দেশে আসন নীচে নামানো হয় এবং আদবের সঙ্গে হযরত কেবলা কাবার রওজা শরীফের পথ অতিক্রম করা হয়। এ ঘটনা থেকেই মাইজভাণ্ডার শরীফের আদব-আখলাকের উন্নত শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা যায়।

॥ ৩ ॥

বাবা ভাণ্ডারী এশকের ত্বরীকায় আনুগত্যের পথ বাতলিয়েছেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায়। তাঁর প্রেমের পথ মূলতঃ পুলসিরাতের মতোই কঠিন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এ ব্যাপারে গজনীর সুলতান মাহমুদের মঙ্গে তাঁর খাদেম আয়াজের সম্পর্কের বর্ণনা প্রদান করা যায়। আয়াজের সঙ্গে সুলতান মাহমুদের সম্পর্ক এবং পারস্পরিক আস্থা এতো সুগভীর ছিল যে, সভাসদরা মনে করতেন সুলতান তাঁর গোলাম আয়াজের পরামর্শ ব্যতীত কাজ করেন না। সভাসদদের চাল চলন এবং কথা বার্তা পর্যবেক্ষণ করে সুলতান আয়াজের অবস্থান বুঝানোর জন্য সভাসদদের ডাকলেন। তিনি তাঁর মহামূল্যবান কোহিনুর পাথর একখণ্ড লোহার ওপর রেখে পাশে একটা হাতুড়ি দিলেন। কোহিনুরটি হাতুড়ির আঘাতে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি-সভাসদদের নির্দেশ দিলেন। মহা মূল্যবান কোহিনুর পাথর ভাঙ্গতে তাঁরা অপারগতা প্রদর্শন করলেন। এরপর সুলতান আয়াজকে ডাকলেন। আয়াজ এলে সুলতান পাথরটি চিনে কিনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে আয়াজ বললেন, "এটি আপনাদের অতিপ্রিয় মহামূল্যবান কোহিনুর।" সুলতান বললেন, "হাতুড়ির আঘাতে কোহিনুরটি গুঁড়িয়ে ফেলো।" আয়াজ এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে কোহিনুর গুঁড়িয়ে দিলেন। সুলতান তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার এত প্রিয় মূল্যবান বস্তুটি তুমি ভাঙ্গলে কেন?" আয়াজ কাতর স্বরে জবাব দিলেন, "আমার সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে, হুজুর আমাকে ক্ষমা করে দিন।" আয়াজ নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থণা করেছে। তবুও একথা বলেনি, "আমি আপনার আদেশে এ কাজ করেছি।" এ ধরনের বাক্যে প্রেমাস্পদকে (মাশুক) দোষারোপ করা হয়। প্রেম কলুষিত হয়। তাই প্রেমাস্পদের আদেশ যা'ই হোক না কেন, প্রেমিককে দায়-দায়িত্বের বোঝা তুলে নিতে হয়।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা ঐশী প্রেমের এই অনন্য কঠিন পথের 'হাদী' বা পথ প্রদর্শক।

সূফি উদ্ধৃতি

■ যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা বা বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে দেখে সে মূলতঃ আল্লাহর নূরের আলোকেই দেখে। তাঁর জ্ঞানের মূল্য আল্লাহ তা'আলা। এ কারণে তাঁর ভুলভ্রান্তির অবকাশ নেই। বরং তাঁর মুখ থেকে যা বের হয় তা আল্লাহরই কথা বটে।

■ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে, যারা আল্লাহর কালামসমূহ প্রকাশে খুবই দক্ষ ও পারদর্শী। তাঁদের বাকপটুতাও আছে কিন্তু আল্লাহর ভয়েই তাঁরা নির্বাক।

–হযরত আবু সাঈদ খাযযার (রহ)

মাশুকের দিদার লাভের পথ

● আবু মোহাম্মদ জাফরুল হক ●

বাদশাহ নামদার, সকল প্রশংসা সেই পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যিনি মানব-কে আশরাফুল মাখলুকাত- রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি মানব-কে স্বীয় আশেকের মর্যাদায় বিভূষিত করিয়া তাঁহার গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। যিনি তাঁহার এই সম্মানজনক পদের যোগ্যতা যাচাই করিয়া দেখার জন্য তাহাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়া দুইটির মাঝখানে অগ্নির দাহিকা স্থাপন করিয়াছেন। যিনি প্রত্যেক জাতির নিকট যুগে যুগে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে যুগোপযোগী তালিম প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যিনি সেই তালিমে পূর্ণতা আনয়নের জন্য রহমতাল্লিল আলামিন হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-কে ধূলির ধরায় প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সম্পদ পবিত্র কুরআন তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন।

একদা তিনি হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সল্লাম-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-ইন্না সানুলকি আলাইকা কাওলান সাকিলা- (হে কম্বলাচ্ছাদিত ব্যক্তি, আপনি উঠুন) আমরা শীঘ্রই আপনার উপর এক ভারি ফরমান জারি করিব। ৭৩৪৫

এই পবিত্র কুরআনই সেই ভারি ফরমান-মানবের ইহলৌকিক পারলৌকিক মুক্তির দিশারী-মাশুকের দিদার লাভের পথ। অন্তর্নিহিত অসীম হেকমতের জন্যই ইহাকে ভারি ফরমান-রূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ইহা এতই ভারি যে যখন মাখলুকাত-কে ইহার ভঅর গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইল, তাহারা সকলেই ভয় ও লজ্জায় নতশির হইয়া রহিল।

এই সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন- আন্না আরাদনাল আমানাতা আলাস-সামাওয়াতে ওয়াল আরধে ওয়াল জেবালে ফা বাইনা আইয়ামেল নাহা ওয়া আশফাকনা মিন হাওয়া হামালাহাল ইনসানু-ইন্নাহু কা'না জালুমান জাহুলা-আমার আমানত বহনের জন্য আসমান-সমূহ, জমিন এবং পর্বতের নিকট পেশ করিয়াছিলাম। সকলেই উহা বহনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিল ও ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু মানুষ উহা বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। নিশ্চয়ই সে অত্যাচারী এবং অজ্ঞ। ৩৩৪৭২

বক্ষে সঞ্চিত বিপুল হেকমতের খনি এই আসমানি কিতাব সাত মনজিল ও তিরিশ পারায় বিভক্ত এবং ইহাতে পাঁচশত আটান্নটি রুকু রহিয়াছে। ইহাতে সুরার সংখ্যা একশত চৌদ্দটি। তন্মধ্যে তিরান্নব্বুই-টি মক্কী এবং একুশ-টি মদনী। মক্কী সুরাগুলির মধ্যে সাধারণতঃ ইয়া আইউহান নাস বা হে আদম সন্তানগণ এবং মদনী সুরায়-ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানুও বা হে ঈমানদারগণ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

ইহার আয়াতের সংখ্যা ছয় হাজার তিনশত পঞ্চাশটি। তন্মধ্যে- বিসমিল্লাহির-রাহমানের রাহিম- এর সংখ্যা একশত তেরটি। বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম ব্যতিরেকে আয়াতের সংখ্যা ছয় হাজার দুইশত সাইত্রিশটি। শব্দের সংখ্যা ছিয়াশি হাজার চারিশত তিরিশটি অক্ষরের সংখ্যা তিন লক্ষ উন পঞ্চাশ হাজার চরিশত সত্তুরটি। তন্মধ্যে- আলেফ-এর সংখ্যা-আটচল্লিশ হাজার চারিশত ছিয়াত্তুরটি

বে- এগার হাজার চারিশত বিয়াল্লিশটি
তে- দশ হাজার একশত নিরান্নব্বুইটি
ছে- এক হাজার দুইশত ছিয়াত্তুরটি
জিম- তিন হাজার দুইশত তিয়াত্তুরটি
হে- তিন হাজার নয়শত তিয়াত্তুরটি
খে- দুই হাজার চারিশত ছেচল্লিশটি
দাল- পাঁচ হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশটি
জাল- চারি হাজার ছয়শত সাতাত্তুরটি
রে- এগারো হাজার সাতশত তিরান্নব্বুইটি
জে- এক হাজার পাঁচশত নব্বুইটি
ছিন- পাঁচ হাজার আটশত একান্নব্বুই-টি
শিন- দুই হাজার দুইশত তিপ্পান্ন-টি
ছোয়াদ- দুই হাজার তেরো-টি
দোয়াদ- এক হাজার ছয়শত সাত-টি
তোয়া- এক হাজার দুইশত সাতাত্তুর-টি
জোয়া- আটশত বিয়াল্লিশ-টি
আইন- নয় হাজার দুইশত বিশ-টি
গাইন- দুই হাজার দুইশত আট-টি
ফে- আট হাজার চারিশত নিরানব্বুই-টি
ক্বাফ- ছয় হাজার আটশত তেরো-টি
কাফ- নয় হাজার পাঁচশত দুই-টি
লাম- তেত্রিশ হাজার চারিশত বত্রিশ-টি
মিম- ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত ষাট-টি

নূন- পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত নব্বই-টি
ওয়া- পঁচিশ হাজার একশত ছত্রিশ-টি
হে- উনিশ হাজার সত্তুর-টি
লাম আলেফ- চারি হাজার সাতশত বিশ-টি
হামজা- চারি হাজার একশত পনেরো-টি
ইয়া- পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শত উনিশ-টি
জবর- তিপ্পান্ন হাজার দুইশত তেতাল্লিশ-টি
জের- উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত বিরাশি-টি
পেশ- আট হাজার আটশত চরি-টি
নোকতা- একলক্ষ পাঁচ হাজার ছয়শত চুরশি-টি
মাদ- এক হাজার সাতশত একাত্তুর-টি
তাশদিদ- এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ-টি এবং
আলেফ মামদুদ- দুইশত চল্লিশ-টি

এই মহাগ্রন্থের প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি সাংকেতিক চিহ্ন মহাজ্ঞানের বিশ্বকোষ এবং চির রহস্যমন্ডিত। ইহার একটি ক্ষুদ্র আয়াতের অর্থও এতই ব্যাপক এবং এতই গভীর যে শুধু পাঠ করিয়া তাহার তলদেশের নাগাল পাওয়া কঠিন। তাই বলা যায়, এই পবিত্র গ্রন্থ শুধু পাঠ করার জন্য নহে- অনুসন্ধিৎসু প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য। বুঝাইবার জন্য নহে- বুঝিবার জন্য। ইহার আক্ষরিক ব্যাখ্যার মধ্যে বিশেষ কোন হেকমত নাই। হেকমতের সন্ধান লাভ করিতে হইলে সাধনার পথে ইহার ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁহার হাবিব-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এই যে গ্রন্থ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি ইহা আশীর্বাদে পূর্ণ, লোকদেরকে ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য যেন তাহারা ইহার আয়াত সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে এবং জ্ঞানী ও বিবেচক লোকেরা যেন ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। ১৬ঃ৪৪

তিনি বলেন-ওমা মিন গায়েবাতে ফিস-সামায়ে ওয়াল আরধে ইল্লা ফি কিতাবুম-মুবিন- আকাশ পৃথিবীতে এমন কোন গোপন বস্তু নাই যাহা কুরআনে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ নহে। ২৭ঃ৭৫

হজরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন- তোমরা কুরআন পাঠ কর এবং ইহার অজানা বিষয়ের অনুসন্ধান কর।-বাইহাকি

এই অজানা বিষয়ের প্রতি ইংগিত করিয়াই হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু বলিয়াছেন- যদি আমি সুরা ফতেহার তফসির করি, তাহা বহণ করিবার জন্য সত্তুরটি উটের প্রয়োজন হইবে।

জনৈক বোজর্গ ব্যক্তির উক্তির মধ্যে হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু-র এই তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের সমর্থন মিলে। তিনি বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনে সাতাত্তুর হাজার দুইশত এলেমের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে পূর্ব জামানার জনৈক বোজর্গ ব্যক্তির উক্তি শ্রবণ করিলে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যাইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন- পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক আয়াতের ষাট হাজার অর্থ আছে।

তাঁহার এই উক্তির অনুসরণে হজরত আবুল ফজল সরাখ্সি রহমতুল্লাহ আলাইহে কর্তৃক প্রদত্ব একটি ক্ষুদ্র আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। একদ হজরত শেখ আবু সাইদ রহমতুল্লাহ আলাইহে তাঁহার নিকট-ইউহেব্বুহুম ওয়া ইউহেব্বুনা-হুম-তিনি তাহাদিগকে ভালোবাসেন তাহারাও তাঁহাকে ভালোবাসেন, এই আয়াতটি পাঠ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে হজরত আবুল ফজল সরাখ্সি রহমতুল্লাহ আলাইহে সারারাত-ব্যাপী ইহার সাতশত প্রকার তফসির করেন। প্রত্যেকটি তফসিরই ছিল নিগুঢ়ার্থক এবং মর্মগ্রাহী। পরে ভোর হইয়া যাওয়ায় তিনি আফসোস করিয়া বলিলেন-হায়, আনন্দ ও বিষাদের কোন ব্যাখ্যাই প্রদান করা হইল না।

একদা হজরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এক জনসমাবেশে- ইন্না তানাজ্জালুল আম্‌রা বাইনা হুন্না- তাহাদের ভিতর তিনি নির্দেশ অবতীর্ণ করেন, এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন- হে লোকসকল, আমি যদি এই আয়াতের মর্মার্থ প্রকাশ করি, তাহা হইলে তোমরা আমার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে- আমাকে কাফের বলিবে।

বস্তুতঃ পাক কুরআনে এলেমের কোন হিসাব নাই। ইহা এক বিশাল দরিয়া বিশেষ। ইহার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা সাধারণ মানবের পক্ষে নিরূপণ করা সম্ভব নহে। সাধারণ জ্ঞানে এই পাক কালামের এলেম-কে দুইটি প্রধান শাখার রূপ দেওয়া যায়। ইহাদের একটি শাখা জড়জগত, অপরটি আধ্যাত্মিক জগতের দিকে প্রসারিত। এই উভয় শাখা সমগ্র সৃষ্টি- কে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্নভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

বাদশাহ নামদার, আপনি যদি কুরআনের মধ্যে যে হেকমত নিহিত রহিয়াছে তাহার দুয়ার খুলিতে চান তাহা কখনো পারিবেন না, কেননা তাহার দুয়ারে একটি মজবুত ধরনের তালা লাগানো রহিয়াছে। আপনি যদি সেই তালা খুলিতে চান তাহা কখনো পারিবেন না, কেননা প্রথমে আপনাকে তাহার চাবিটি খুঁজিয়া বহির করিতে হইবে।

(চলবে)

জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফছিরে ছুরা এনশেরাহ্

● হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী ●

জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফছিরে ছুরা এনশেরাহ্ হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী (রহঃ) (১৮৮০-১৯৮৫ইং) রচিত একটি সুলিখিত গ্রন্থ। লেখক একজন উঁচু ধরণের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। মুসলমান তথা সমগ্র মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ওয়াজ ও লেখনির মাধ্যমে তাঁর পবিত্র হায়াতে জিন্দেগীতে আল্লাহর দিকে অবিরত দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। উল্লেখিত গ্রন্থে তিনি পবিত্র কালামের ৯৪ তম সূরা আলাম নাশরাহ্ এর সূফিয়ানা তফসির পেশ করেছেন। সম্মানিত গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর অনুসৃত বানান ও বাক্যগঠন পদ্ধতি হুবহু বজায় রেখে আমরা তা এখানে প্রকাশ করছি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ্ তাআলা ছা'লাত্ বা নমাজকেও احمد শব্দের ছুরতে সমাপন করার বিধান করিয়াছেন। অতএব নমাজে ا অক্ষরের ন্যায় সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হয়, ح অক্ষরের মত কুঁকিয়া রুকু করিতে হয়, م অক্ষরের অনুরূপ ছেজদা করিতে হয়, আর د অক্ষরের মত বসিয়া "আত্তাহাইয়্যা" পড়িতে হয়। অর্থাৎ মোছল্লী নিজ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা احمد শব্দের ا-ح-م-د অক্ষর চতুষ্টয়ের আকারে কেয়াম, রুকু, ছজুদ ও কউদ সমাধা করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা احمد শব্দের আকার গঠন করে এবং ব্যক্ত করে যে, আমি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাও আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিতেছি। এইরূপে, মোছল্লীর অন্তরে যে আল্লাহ তাআলার গুণ কীর্ত্তন, ভক্তি, স্তুতি, প্রেম, আনুগত্য, বিনয়, কাকুতি মিনতি, রুজু, উপস্থিত, নৈকট্য ও মিলনের ভাব আছে উহা কথার দ্বারা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ব্যক্ত করাই ছা'লাত-এ ফর্জি, যাহা দৈনিক পাঁচ বার সমাপন করা হয়।

আমাদের রছুল-এ-করিম (দঃ) এর স্বর্গীয় নাম "আহমদ" শব্দের দ্বারা বহুরূপে তাঁহার জিকর উচ্চভাবে ঘোষিত হয়। "আহমদ" শব্দের আরও বহু গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। তাহা সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য নহে বলিয়া এস্থলে লিখা গেল না।

রছুল-এ-করিম (দঃ) এর আর এক মোবারেক নাম মোহাম্মদ (দঃ)। ইহার অর্থ প্রশংসিত ও প্রশংসাকারী। হাদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার محمد (মোহাম্মদ) মোবারেক নুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই "নুরে মোহাম্মদী" (দঃ) সর্ব্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলাকে পাঁচ বার ছেজদা করিয়া আল্লাহ্ তাআলার অত্যধিক প্রশংসা করেন। তজ্জন্য আল্লাহ্ আআলা তাহার নাম মোহাম্মদ (দঃ) অর্থাৎ অত্যধিক প্রশংসাকারী রাখেন এবং তাঁহার উপর ও তদীয় উম্মতগণের উপর দৈনন্দিন পাঁচ বার নমাজ ফরজ করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি "হাকিকতে আহমদীয়ার" মোকামে অত্যুচ্চ ভাবে প্রশংসিত হন। অতঃপর "হাকিকতে মোহাম্মদীয়ার" মোকামে বিশেষ রূপে প্রশংসিত হন।

আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম তাঁহার "নুর" মোবারেক সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতে যাবতীয় সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে বলিয়া হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। যথাঃ রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

اوّل ما خلق الله نورى وكلّ الخلائق من نورى অনুবাদঃ আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নুর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমার নুর হইতে অপরাপর সব সৃষ্টি হইয়াছে। (হাদীছ)। তারপর আলম-এ-আরওয়াহুর মোকামে সমস্ত নবীগণের রূহ কর্ত্তৃক কলেমা-এ-তৈয়্যবা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ" (দঃ) পঠিত ও তিনি "নবীউল আম্বিয়া" বা নবীগণের নবীরূপে বরিত ও উচ্চভাবে প্রশংসিত হন।

হজরত আদম (আঃ) হইতে হজরত ঈসা (আঃ) পর্য্যন্ত সমস্ত নবীগণের ছহিফা ও কিতাব সমূহে তিনি আল্লাহ্ তাআলা কর্ত্তৃক উচ্চভাবে প্রশংসিত এবং সব নবী কর্ত্তৃক তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রশংসা উচ্চভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে তাঁহার প্রাথমিক অবস্থা অপেক্ষা পরবর্ত্তী অবস্থা অধিকতর প্রশংসিত হইতে থাকিবে বলিয়া স্বপ্নে ফেরেস্তা কর্ত্তৃক তাঁহার মহিমাময়ী জননী বিবি আমেনার প্রতি সুসংবাদ প্রদত্ত হয়। যথাঃ আল্লামা বরজঞ্জি (রঃ) বলিয়াছেন,

واوتيت امه فى المنام فقيل لها انك حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه اذا وضعته محمدا فانه ستحمد عقباه۔

অনুবাদঃ বিবি আমেনার নিকট স্বপ্নে ফেরেস্তা আগমন করেন এবং তাঁহাকে বলা হয় যে, "হে আমেনা বিবি, তুমি

গর্ভবর্তী হইয়াছ। তোমার গর্ভস্থ সন্তান সমগ্র জগতের সরদার এবং সমস্ত সৃষ্টির সেরা। যখন তোমার সন্তান ভূমিষ্ট হন, তখন তাঁহার নাম "মোহাম্মদ" রাখিও। তাঁহার প্রাথমিক অবস্থা অপেক্ষা পরবর্ত্তী অবস্থা অধিকতর প্রশংসিত হইতে থাকিবে।"

তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন আবরাহা নামক জনৈক আবিসিনিয়ার শাসনকর্ত্তা হস্তী বাহিনীর দ্বারা পবিত্র কাবা গৃহ ধ্বংস করার চেষ্টা করিলে, আল্লাহ তাআলা পক্ষীর ঝাঁক কর্তৃক সেই বাহিনীর উপর প্রস্তর বর্ষাইয়া আরোহী সহ হস্তী দলকে ধ্বংস ও নিষ্পেষিত করিয়া রছুল-এ-করিম (দঃ) -এর ভবিষ্যৎ কেবলা, কাবাগৃহকে রক্ষা করেন। তখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন, সুতরাং ইহা তাঁহার "এরহাছ" শ্রেণীয় মোজেজা বিশেষ। এতদ্বারাও তিনি উচ্চ প্রশংসিত ও শোহরৎ প্রাপ্ত হন। তিনি ভূমিষ্ট হওয়ার সময় তাঁহার মাতা আমেনা বিবির সেবার জন্য বিবি আছিয়া, বিবি মরিয়ম ও হুর প্রভৃতি স্বর্গীয় রমণীবৃন্দের এবং ফেরেস্তাগণের আগমন আর স্বর্গীয় জ্যোতির উদ্ভাসন আর সেই জ্যোতিতে আমেনা বিবি মক্কায় নিজ গৃহে থাকিয়া সিরিয়া দেশস্থ অট্টালিকা ও প্রাসাদ সমূহ পরিদর্শন পরন্তু আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছুওয়ায়বা আমেনা বিবির গৃহের অলৌকিক ব্যাপারাদি দর্শন করিয়া তাহা লোকের নিকট বর্ণনা করার দ্বারা তাঁহার [অর্থাৎ শিশু মোহাম্মদ (দঃ)-এর] মহিমা কাহিনী লোক সমাজে ঘোষিত হয় এবং তাঁহার জিক্‌র উচ্চ হয়। ইহা আল্লামা বরজঞ্জি (রঃ) ও বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

তিনি ধাত্রী হালিমা বিবির দুগ্ধ পান কালে তাঁহার এক স্তনের দুগ্ধ পান করিতেন। অপর স্তন মুখে দিলেও তাহা চুষিতেন না। ইহাতে জানা গিয়াছিল যে, তিনি অপর স্তনের দুগ্ধ তাঁহার দুধ ভাইয়ের জন্যই রাখিয়া দিতেন। তদ্বারা শৈশবেও তাঁহার ন্যায় বিচারের কাহিনী ঘোষিত হয়।

তিনি শৈশবে অন্যান্য শিশুদের সহিত মিলামিশা করিতেন বটে কিন্তু তাহাদের সহিত খেলা-ধুলায় বিশেষ যোগদান করিতেন না। খেলা সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ করিয়া ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে তিনি "ছালেছ" বা মধ্যস্থ হইয়া তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন। তজ্জন্য বালকগণ তাঁহাকে "আচ্ছাদেক" "আল্ আদেল" বলিয়া সম্বোধন করিত। এতদ্বারা শৈশবেও তাঁহার মাহাত্ম্যের জিকর সমাজে উচ্চভাবে ঘোষিত হয়।

তিনি ধাত্রী হালিমা বিবির বাড়ীতে অবস্থান কালে অত্র ছুরা-এ-এনশেরাহর তফছীরে বর্ণিত "শক্কে-ছদর" মো'জেজার দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্যের জিকর উচ্চভাবে ঘোষিত হয়। আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে তিনি স্বীয় ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা ও ন্যায় বিচার ইত্যাদি মহৎ স্বভাব সমূহের দ্বারা শৈশবে "আল্-আদেল", "আছ্ছাদেক" এবং কৈশোরে "আমিরে কাফেলা" যৌবনে "আল্-আমিন" প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত হন এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার মাহাত্ম্যের শোহরৎ হয়। তাঁহার যৌবন কালে তদীয় পবিত্র আদর্শ চরিত্রাবলীর দ্বারা তিনি সমাজে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সেই সময় কা'বাগৃহ মেরামত করার একান্ত দরকার হওয়ায় মক্কার সব গোত্রের লোকগণ মিলিতভাবে তাহা সমাধা করেন। মেরামতের সময় কা'বা গৃহস্থ হাজুরে আছওয়াদ, যাহা আদম (আঃ) কর্তৃক আনীত ও কা'বা গৃহে স্থাপিত এবং সব লোকগণ কর্তৃক সম্মানীত ছিল, সেই বরকতওয়ালা পাথরখানা, মেরামত কার্য্যের সুবিধার জন্য অন্যত্র সরাইয়া রাখা হইয়াছিল। সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর উহা পূর্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার আবশ্যক হইল। গোত্রের যেই নেতা উহা উঠাইয়া নিয়া পূর্বস্থানে স্থাপন করিবেন, সমাজে তাঁহার মর্য্যাদা ও আধিপত্য বাড়িয়া যাইবে। এই কারণে প্রত্যেক গোত্রের নেতা উহা উঠাইয়া নিয়া পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করার প্রার্থী হইলেন। কেহই নিজ দাবী ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। ইহাতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের সূচনা হইল। চারিদিকে "সাজ" "সাজ" রব পড়িয়া গেল। পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে দেশ রক্ত-প্লাবিত হওয়ার আশংকা দেখিয়া জ্ঞানী লোকগণ, সকলকে সমবেত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এই কাজের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া স্বদেশকে ধ্বংস করা উচিত হইবে না। সকলের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হওয়া উচিৎ। কিভাবে আপোষ মীমাংসা হইতে পারে তাহা স্থির করার জন্য প্রধান চারি গোত্রের চারি জন নেতা কাবা গৃহে বসিয়া পরামর্শ করিলেন যে, তাঁহারা চারি জন নেতা সারা রাত্রি কা'বা গৃহে থাকিবেন। অতি ভোরে মহল্লা হইতে যেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম আসিয়া কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন, তাঁহাকেই সালিশ মান্য করা হইবে। তিনি যাহাকে উক্ত হাজুরে আছওয়াদ উঠাইয়া আনিয়া পূর্ব স্থানে স্থাপন করিতে বলেন সেই নেতাই তাহা করিবেন এবং অপর তিন জন নেতা তাহাতে রাজী থাকিবেন। ইহা সাব্যস্থ হওয়ার পর তাঁহারা চারি জন কা'বা গৃহে রাত্রি যাপন করিলেন এবং সর্বাগ্রে কে কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন তাহা দেখিয়া

রহিলেন। আল্লাহ তাআলার অপার মহিমায় যুবক মোহাম্মদ (দঃ) সেইদিন অতি ভোরে সর্বপ্রথম কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই যে আমাদের 'আল-আমিন' আসিয়াছেন। ইনিই মীমাংসা করিবেন।" এই বলিয়া নেতা চতুষ্টয় তাঁহাকে সালিশ মানিলেন। তখন মোহাম্মদ (দঃ) নিজ মোবারেক চাদর বিছাইয়া নিজ দুই হাতে হাজ্বরে আছওয়াদ্ উঠাইয়া আনিয়া উক্ত চাদরের উপর রাখিলেন এবং চারি গোত্রের চারি জন নেতাকে উক্ত চাদরের চারি কোণ ধরিয়া উঠাইতে বলিলেন। তাঁহারা চারি জন চারি কোণ ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিলে, তাহা সম্ভব হইতেছে না দেখিয়া মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং উক্ত হাজ্বরে আছওয়াদকে দুই হাতে ধরিয়া উঠাইলেন এবং সকলে মিলিয়া উহা পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করিলেন। ইহাতে চারি জন নেতাই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং মোহাম্মদ (দঃ) এর এই অভূতপূর্ব মহা জ্ঞান ও ন্যায় বিচার দেখিয়া সকলেই তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী চারি জন লোক সন্তুষ্ট হইয়া যায় মত বিচার করা মানব জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নহে। ইহাও আমাদের রছুল-এ-করিম (দঃ) এর এরহাছ বা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের একটি বিশেষ মো'জেজা বলিয়া "যখিরাতুল ওকবা" নামক তফছিরে ছহিহ্ হাদিছ বলিয়া রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

ورفعنا لك ذكرك (অর্থাৎ এবং আমি তোমার জন্য তোমার জিকরকে উচ্চ করিয়াছি) এই আএত সম্বন্ধে একদিন রছুলুল্লাহ্ (দঃ) হজরত জিব্রাইল (আঃ)-এর নিকট জানিতে চাহিলেন যে, "আল্লাহ্ তাআলা আমার জিকরকে কিরূপে উচ্চ করিয়াছেন?" হজরত জিব্রাইল (আঃ) জওয়াব দিলেন, আপনার জিকর আল্লাহ তাআলা আজানে, একামতে, খোৎবায়, তাশাহুদে, কলেমা-এ-তৈয়্যবে কলেমা-এ-শাহাদতে ও তাবেদারীর কাজ সমূহে নিজ জিকরের কাছাকাছি রাখিয়াছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ নিজ নামের সঙ্গে রছুলুল্লাহ (দঃ) এর নামও জিকর করিয়াছেন)। যথাঃ তাবেদারী সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন,

اطيعو الله واطيعو الرسول واولى الامر من كم - الاية

অনুবাদঃ তোমরা আল্লাহ্ তাআলার তাবেদারী কর এবং রছুল (দঃ) এর তাবেদারী কর। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা "উলীল আমর" (বলিয়া শরীয়তের দলীলাদির দ্বারা সাব্যস্থ হইয়াছে) তাঁহাদেরও তাবেদারী কর। (কোরআন)। আল্লাহ্ ও রছুল (দঃ) এর তাবেদারী করা ফর্জ্জ। আর "উলীল আমর" বলিতে মজ্হাবের ইমাম, ত্বরীকতের ইমাম, রাষ্ট্র নেতা, মা-বাপ, (স্ত্রীলোকের) স্বামী প্রভৃতি বুঝায়। সুতরাং স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে উলীল আমরের তাবেদারী করা ওয়াজেব হয়। কলবের নয়টি আকিদা বা হক্ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস্য বিষয় আছে। যে ব্যক্তি এই হক্ বিশ্বাস করে, তাহার ঈমান কামেল হয়। আর কলবের ২১ টি পূণ্যময় "আমল" আছে। যেই জন উহা হক ভাবে "আমল" করে তাহার "আখ্লাক্-এ-হামিদা" বা মহৎ স্বভাব সমূহ হাছিল হয়। অতএব উক্ত বিষয়ের এলম শিক্ষা করাও ওয়াজেব এবং সেই এলমের শিক্ষা দাতা হইলেন নায়েব এ রছুল, ওলী-মোর্শেদ, ত্বরীকতের ইমামগণ, উলীল আমর। তাঁহাদের কোন একজনের ত্বরীকা গ্রহণ করা ও তাঁহার তাবেদারী করা বিশেষ ওয়াজেব। সাতচল্লিশের অধিক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা সমাপন করার পুণ্যময় আমল আছে। তাহা পালন করিতে মজহাবের চার ইমামের কোন একজনের তাবেদারী করা ওয়াজেব। ইছলামী রাষ্ট্র নেতার তাবেদারী করাও ওয়াজেব। এই আএত হইতে অন্যান্য জরুরী মছআলা সমূহ আমি "ফয়উজাতুর রাহমানিয়া" নামক আরবী-ফার্সি রেছালায় ও তদ্ বাংলা অনুবাদ "ফতুহাতে রব্বানিয়া" নামক কিতাবে শরীয়তের দলিলাদিসহ লিখিয়াছি। প্রথমটি ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠকগণ তাহা পড়িয়া সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

তাবেদারীর আমল সমূহের আদেশে যে আল্লাহ তাআলার জিকরের সঙ্গে রছুল (দঃ) এর জিকর রহিয়াছে তাহা উপরোক্ত আএত দ্বারা বুঝা যায়। অন্য আএতে আল্লাহ বলিয়াছেন: من يطع الرّسول فقد اطاع الله - الاية অর্থাৎ যেই ব্যক্তি রছুল (দঃ) এর তাবেদারী করিল, তবে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার "এতা আৎ" বা তাবেদারী করিল, আল্লাহ তাআলার বাধ্য হইল। তাবেদারীর আমল সমূহের আদেশে যেমন আল্লাহ্ তাআলার জিকরের সঙ্গে রছুল (দঃ) এর জিক্রের সঙ্গে সঙ্গে রছুল (দঃ) এর অবাধ্যতার শাস্তিরও জিক্র রহিয়াছে। যথাঃ আরেক আএতে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন,

من يعص الله ورسوله فانّ له نار جهنم خالدين فيها ابدا - الاية

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং রছুল (দঃ) এর অবাধ্যতা করে তবে নিশ্চয়ই তাহার জন্য জাহান্নামের আগুনের শাস্তি, তথায় অনন্তকাল (হামেশা) জ্বলিতে থাকিবে। (কোরআন)

(চলবে)

মাইজভান্ডারী দর্শন *

● মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ●

শুধু দেখা নয় উপলব্ধি

'দর্শন' এর সাধারণ অর্থ দেখা। চোখ থাকলে দেখা যায়। মানুষের চোখ কিন্তু আলো না থাকলে কিছুই দেখতে পায়না। এটাই মানুষের দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা। অন্ধ মানুষ কিন্তু আলোর উপস্থিতিতেও দেখতে পায়না। এখানেই আলোর অপারগতা। দৃষ্টিশক্তির সাথে আলোর মেলবন্ধন হলেই দেখা সম্ভব। কিন্তু দেখার রকমফের আছে। মানুষের চোখ শুধু দু'টো জিনিষই দেখে – একটা 'আকার' অন্যটা 'রঙ'। দু'টোই বাইরের জিনিষ। মানুষ এ দু'টো জিনিষকে উপভোগ করে। কিন্তু কোন জিনিষের বাইরের রূপ দেখে বস্তুর আসল স্বরূপ বুঝা যায় না। এর জন্য চাই অন্তর দৃষ্টি। মানুষ চায় তার দেখাটা সত্য না মিথ্যা তা যাচাই করতে। মানুষ খালি চোখে দেখে দিগন্তে আকাশের প্রান্ত মিশে আছে জমিনের মাটি ছুঁয়ে। বাস্তবে আকাশ কোনদিনও জমিনকে ছোঁয় না। এটাই মানুষের দৃষ্টির বিভ্রম। দৃষ্টির বিভ্রমকে কাটিয়ে সত্যকে যা ছুঁতে পারে সেটাই দর্শন। উপভোগের দেখা তাই দর্শন নয়, উপলব্ধির দেখাই দর্শন। উপলব্ধির দর্শন মানুষকে সত্যে উপনীত করে। সত্য তাকে নিয়ে যায় উন্নতির শিখরে। উপভোগের দৃষ্টি মানুষকে নিয়ে যায় মিথ্যার কুহকে। মিথ্যা তাকে টেনে নিয়ে যায় পতনের গভীরে।

দু' বিপরীত সম্ভাবনার মাঝামাঝি

মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করা হয়েছে। সকল সৃষ্টির মাঝে সে হচ্ছে সেরা। পবিত্র কুরআন তাকে বর্ণনা করেছে 'আশরাফুল মখলুকাত' হিসাবে। কিন্তু তাকে পরক্ষণে বলা হয়েছে 'ছুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফেলিন'। পতনের সর্বনিম্নস্তরে তাকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তার মাঝে আছে একাধারে উত্থানের পরম সম্ভাবনা আবার পতনের চরম উপাদান। মানুষ উপলব্ধির দর্শনকে অবলম্বন করবে, না গ্রহণ করবে দৃষ্টির বিভ্রম, এর ওপর নির্ভর করছে তার উত্থানের সোনালী সম্ভাবনা ও পতনের ক্লেদাক্ত জিল্লতি।

ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি

এ দু' বিপরীতমুখী সম্ভাবনার মধ্যে কোনটিকে সে বেছে নেবে সেটা তার স্বাধীন বিবেকের কাছে ছেড়ে দিয়ে ইসলাম সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কাঁধে এক বিশাল দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। হয়তো সে আল্লাহর নির্দেশকে পালন করে তার সামনের অনন্ত সম্ভাবনার দুয়ারকে উন্মুক্ত করবে নতুবা আসমানী নির্দেশের প্রতি বিমুখ হয়ে পতনকে অনিবার্য করে তুলবে।

এতদসত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টির শুভ কল্যাণ কামনা করে বলে ইসলাম মানুষের প্রতি ক্লান্তিহীন আহ্বান জানিয়ে আসছে সে যেন আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলগণ (তাঁদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর অপার শান্তি ও অবারিত রহমত) একই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আল্লাহর সর্বশেষ আসমানী প্রতিনিধি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সে অনন্ত আহ্বানের চূড়ান্ত ও সফল পরিণতি দান করেছেন। তাঁর মাধ্যমে শেষ হয়েছে আসমানী ওহীর সর্বশেষ অবতরণ। কিন্তু তাঁর সে শাশ্বত আহ্বান মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকেনি। তাঁর যোগ্য অনুসারীরা পৃথিবীর আনাচে কানাচে সকল স্তরের মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার ব্রত গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর ওলীগণ যুগে যুগে সে উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন।

মাইজভান্ডারী দর্শন

মাইজভান্ডারী দর্শন ইসলামের সে বিশ্বদৃষ্টির উত্তরাধিকার বহনকারী একটি জীবন্ত ও জীবন ঘনিষ্ঠ দর্শন। কুরআনের বাণীর নিরিখে ও রসুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার আলোকে এ দর্শনের বহিরঙ্গ ও ভিতরঙ্গ নির্ণীত ও আলোকিত। মাইজভান্ডারী দর্শনকে বুঝতে হলে তাই কুরআনকে বুঝতে হয়। কুরআনী দর্শনের এটি একটি ফলিতরূপ। কুরআনী দর্শনের মূল সুর হচ্ছে: ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব। মাইজভান্ডারী দর্শনের মূল চরিত্রও তাই।

আল্লাহর পানে অবিরাম অভিযাত্রা

মাইজভান্ডারী দর্শন মানুষকে আল্লাহর পথে অবিরাম অভিযাত্রার জন্য প্রস্তুত করে ও তাকে সেদিকেই ধাবিত করে। এটা কোন বেপরোয়া অভিযান নয়। এ অভিযানের দরজা আছে, পথ আছে, পথের সাথী আছে ও পথের রাহবার আছে। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দরজা দিয়ে প্রবেশ কর'। আল্লাহর হাবিব বলেছেন, "আমি ইলমের শহর আর আলী তার দরজা।' এর পথ হচ্ছে জিকিরের পথ। আল্লাহর বাণী: "আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব।" আহ্! কী জোরালো, কী শুভ্রতম, শুদ্ধতম, সুন্দরতম আশা-জাগানিয়া প্রতিশ্রুতি! এ পথের সাথী হচ্ছে পৃথিবীর তাবত সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি। এ পথের রাহবার হচ্ছেন রাসুলের

সার্থক উত্তরাধিকারী আল্লাহর ওলীগণ।

সমাবেশ ও সমন্বয়ধর্মী

মাইজভাণ্ডারী দর্শন এর প্রাণ পুরুষ হচ্ছেন গাউসুল আযম হযরত শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) (১৮২৬-১৯০৬) বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশ যখন বৃটিশদের দাসত্বশৃঙ্খলে পিষ্ট হচ্ছিল তখনকার এক ঘোর দুর্দিনে পৃথিবীতে তাঁর আগমন ও প্রস্থান। তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না। কিন্তু বলেছিলেনঃ "আমি কাছারি পাহাড় থেকে ইংরেজদের নামিয়ে দিয়েছি।" বৃটিশদের ভবিষ্যত পরিণতি (১৯৪৭ এর আগষ্টে বৃটিশ এ দেশ ছেড়ে চলে যায়) জানিয়ে দিতে তিনি বর্তমানসূচক কাল ব্যবহার করেছিলেন। এখানে একটা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মানুষের জন্য কাল তিনটিঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। কিন্তু মহান আল্লাহ পাকের কাছে সবকিছুই বর্তমান। আল্লাহর ওলীরা আল্লাহর অভিপ্রায়রই প্রতিধ্বনি করে থাকেন। তাই তিনি বর্তমানসূচক বাক্যে ভবিষ্যতকে প্রকাশ করেছিলেন। যাহোক। ১৯১৪ ও ১৯৩৯ সালে ইউরোপে দু' দুটো যুদ্ধ হয়েছিল যা ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ রূপে পরিচিত। এরপর সারা ইউরোপ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চারিদিকে শান্তির জন্য হাহাকার পড়ে যায়। এ যুদ্ধগুলো সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মানুষ ভাবতে থাকে সকল মানুষকে নিয়ে, সকল মানুষের অধিকার স্বীকার করে সমবেতভাবে বাস করতে না পারলে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই তারা ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। যদিও জাতিসংঘ বর্তমানে (২০১২ সালে) আমেরিকা নামক একটি বৃহৎ পরাশক্তির আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়েছে তথাপি শান্তিকামী মানুষদের সেদিনের প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলার পর কিছু মানুষের চিন্তায় যে ভাবনা স্থান পেয়েছিল চড়া মূল্য দেয়ার পর, তারও বহুদিন পূর্বে আল্লাহর এ মহান ওলী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে বসবাসের জন্য একটি সমাবেশ ও সমন্বয়ধর্মী সমাজ ব্যবস্থা চালুর সূচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর গাউসিয়তের দরবারকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। মানবজাতি যে একই আদি মা-বাবা থেকে উদ্ভূত এ নির্ভেজাল সত্যটি পবিত্র কুরআনই প্রথম প্রকাশ করে। মানুষে মানুষে সৃষ্টিগতভাবে যে কোন ভেদাভেদ নেই রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেছেনঃ "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে আল্লাহর পরিবারকে ভালবাসে।"

সবার প্রতি ভালবাসা

ভালবাসার দাবি হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা। এ কামনা শুধু সাধু ইচ্ছায় সমর্পিত নয়। বাস্তব কল্যাণ সাধন করাই ভালবাসার প্রমাণ। কল্যাণব্রতের এ দর্শন রহমাতুল্লিল আলামীনের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যকে জোরালোভাবে ধারণ করে আছে মাইজভাণ্ডারী দর্শন। ভালবাসার পাত্রকে প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী চলতে দেয়ার বা তার খেয়ালখুশির অনুসরণ করার সুযোগ দেয়ার নাম ভালবাসা নয়। বরং প্রবৃত্তির খেয়ালখুশির অনুগামী না হয়ে সে যেন উন্নত চরিত্র ও পবিত্র আত্মার অধিকারী হয়ে প্রকৃত অর্থে সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত হতে পারে তার প্রচেষ্টা চালানো।

প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ

মানুষের মধ্যে নানা রিপুর সমাবেশ বাস্তব সত্য। এগুলোকে নির্মূল করা যায় না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ষড়রিপুকে দমন করে আত্মসন্তুষ্ট আত্মার অধিকারী হতে পারা মানুষের জন্য বিরাট সাফল্য। এ সাফল্যের পথে তাদেরকে ক্রম অগ্রসরমান করে তোলা মাইজভাণ্ডারী দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

সৃষ্টির সেবা

ইসলাম মানুষের কর্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ। আল্লাহর হক ও বান্দার হক। কোনটাকে অবহেলার সুযোগ নেই। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের পক্ষে আল্লাহর হক কতটুকু আদায় করা সম্ভব তা বলা কঠিন। তবে নিবেদিত প্রাণ ইবাদতকারী আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করতে পারে। কারণ আল্লাহর রহমত আল্লাহর গযবকে অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু বান্দার হক আদায় করা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। সমাজ ও প্রতিবেশি, আপনজন, আত্মীয়স্বজন, বঞ্চিত মানবতা ও সকল সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন না করে মানুষ মুক্তি পেতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষ তার অবস্থা ও অবস্থান, শক্তি ও সামর্থ্য, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনুযায়ী হক্কুল ইবাদ করতে বাধ্য। মাইজভাণ্ডারী দর্শন ইসলামের এ সুবিবেচনামূলক দায়িত্ব পালনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

সমালোচনা নয় আত্মসমালোচনা

অন্যের মধ্যে নয় নিজের মধ্যে চরিত্রগত ও আচরণগত ত্রুটি খোঁজার দাবী করে এ দর্শন। এতে মানুষের আত্মশুদ্ধির পথ সুগম হয়। অন্যের মধ্যে যে ত্রুটি আমাদের চোখ ও মনকে পীড়িত করে সে সব ত্রুটি পরিহার করতে পারলেই মানুষের চরিত্র সংশোধিত হয়।

আত্মপ্রচার নয় আত্মপ্রসার

আত্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা হালকা, খেলো, সস্তা ও স্থূল

মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এক ধরণের বালখিল্যপনা। আত্মপ্রসারের সাধনার মাধ্যমে ঘটে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। মাইজভান্ডারী দর্শন মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ-প্রয়াসী।

আত্মশ্লাঘা নয় আত্মোপলব্ধি

জীবনের সামান্য সাফল্যে আত্মশ্লাঘা নয় আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ক্রমশ শীর্ষমুখী উত্থান ঘটানো মাইজভান্ডারী দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য।

বিনয়, আদব ও মহব্বত

ইসলামের আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য হচ্ছে বিনয়, আদব ও মহব্বত। আল্লাহর কাছে যে বিনীত আল্লাহ তাকে জীবনে উন্নত করেন। আদব বুলন্দ নসীবের সোপান। মহব্বত দেয় সান্নিধ্য। মাইজভান্ডারী দর্শন মানুষকে বিনয়, আদব ও মহব্বত শিখায়।

বিত্তের আরাধনা নয় চিত্তের সাধনা

মাইজভান্ডারী দর্শন সম্পদের পূজা করে না। সম্পদকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে। দুনিয়ার পেছনে সে ধাবিত হয় না। দুনিয়াকে অগ্রাহ্য করে বলে দুনিয়া এর পেছনে দাঁড়ায়। তাই বিত্তের আরাধনা নয় চিত্তের সাধনাই তার লক্ষ্য। বিত্তের প্রকাশে নয় চিত্তের বিকাশেই মানুষের মর্যাদা শীর্ষমুখী হয়। মাইজভান্ডারী দর্শনের অন্যতম সফল রূপকার বিশ্ব ওলী শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী কঃ) তাঁকে নজরানা হিসাবে ভক্ত মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত দানকৃত টাকা থেকে বেছে বেছে কিছু টাকাকে পুড়ে ফেলতেন। কারণ সত্য থেকে মিথ্যা পৃথক হয়ে গেছে আগেই।

পবিত্র রিজিক

আল্লাহ মানুষের জন্য পবিত্র জিনিষকে হালাল করেছেন। হালাল খাওয়া মাইজভান্ডারী দর্শনের পরম প্রতিপাদ্য। হারাম খাদ্য ভক্ষণে মানুষের ইবাদত কবুল হয় না। কবুতরের মত বছে খাওয়া মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খুবই জরুরী। বাতিল পন্থায় সম্পদ আহরণ তাই মাইজভান্ডারী দর্শনের পরিপন্থী।

লুণ্ঠন নয় বন্টন

মাইজভান্ডারী দর্শনের শিক্ষা হচ্ছে মানুষের হাত হবে বন্টনের হাত, লুণ্ঠনের নয়। হাত হচ্ছে মানুষের জন্মগত, আদি ও প্রাথমিক হাতিয়ার। হাত আছে বলে হাতাহাতি করতে হবে এটা মাইজভান্ডারী দর্শন নয়। এখন তো বিশ্ব জুড়ে যে অর্থনীতি চলছে তা হচ্ছে হাতিয়ে নেয়ার অর্থনীতি। মানুষ একদিকে অর্থনৈতিক মুক্তি খুঁজছে আর অন্যদিকে ওঁৎ পতে আছে কিভাবে কার কাছ থেকে কখন কতটুকু হাতিয়ে নেবে। মানুষকে নিদেনপক্ষে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হলেও মানুষের হাতকে করতে হবে বন্টনের হাত, লুণ্ঠনের নয়।

দেয়াল নয় সেতু

মানুষে মানুষে সেতুবন্ধনই মাইজভান্ডারী দর্শনের লক্ষ্য বিভাজনের দেয়াল সৃষ্টি নয়। জীবন নদী পার হতে সেতুরই প্রয়োজন। যে তার চারদিকে দেয়াল তুলেছে সে অচিরেই একলা হয়ে পড়েছে।

মজলুমের পক্ষে

মাইজভান্ডারী দর্শনের অবস্থান মজলুমের পক্ষে। মাইজভান্ডারী দর্শনের প্রাণ-পুরুষ হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (ক.) এর যে কেরামতটি সবার কাছে মশহুর হয়ে আছে তা হচ্ছেঃ সুদুর পাহাড়ী পথে বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত এক অসহায় ভক্তকে নিজ পুকুর ঘাটে ওজুর উদ্দেশ্যে মজুত বদনা ছুঁড়ে মেরে সে হিংস্র বাঘের কবল হতে মুক্ত করা। তাঁর ওজুর সে বদনাটি পৃথিবীর যাবতীয় জালিম যারা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জোরে বিশ্বমানবতাকে নিত্য আক্রমন করে চলেছে তাদের দানবীয় মুখের ওপর ছুঁড়ে মারার বেলায়তি হাতিয়ার।

শান্তি ও স্বস্তি

সকল সৃষ্টির মূল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে শান্তি ও স্বস্তি। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যাদের দ্বারা পরিচালিত তারা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, প্রতাপ ও প্রতিপত্তির প্রয়াসী। দাপট প্রদর্শনের অশুভ প্রতিযোগিতায় তারা মানুষের জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাস, নিপীড়ন ও জুলুম। সবচেয়ে আতঙ্ক ও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর জুলুমবাজ নেতারাই 'সন্ত্রাস' 'সন্ত্রাস' বলে এমন এক মাতম তুলেছে যাতে কে আক্রমনকারী আর কে আক্রান্ত তা বোঝাই যায় না। মজলুম ও জালিমের মধ্যে পার্থক্য তাদের রাজনৈতিক মতলবের প্রয়োজনে নির্ধারিত হয়। নিজস্ব সংজ্ঞায় তারা কথা বলে। সার্বজনীন সংজ্ঞা তাদের অভিধান থেকে বিদায় নিয়েছে। মানুষের মাঝে শান্তি ও স্বস্তি সৃষ্টির প্রকৃত প্রয়াস মাইজভান্ডারী দর্শনের মূলকথা। কারণ এ দর্শন বিশ্বাস করে মানুষ তার ভাইয়ের জন্য তাই কামনা করবে যা সে নিজের জন্য কামনা করে।

উচ্চারণ নয় অনুশীলন

এ দর্শন শুধু মুখে উচ্চারণের জন্য নয় বরং তা বাস্তবজীবনে অনুসরণের জন্য।

---

* তৃতীয় আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনের দ্বিতীয়দিন ১০ মার্চ ২০১২ তারিখে পঠিত।

ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার ও দাসমুক্তির সংগ্রামে দুই পুরোধা সূফী মনীষা হযরত শেখ ইউসূফ (রঃ) ও হযরত তুয়ান গুরু (রঃ)

● মোঃ মাহবুব উল আলম ●

সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী উৎপীড়ক ঐতিহ্য ঐতিহাসিক। দাসপ্রথাসমেত বিভিন্ন জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানবতার মুক্তির পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে ছিল শান্তির ধর্ম ইসলাম। এই সংগ্রামের প্রথম কাতারে ছিলেন অনেক সূফীয়ায়ে কেরাম। আজ আমরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ ঈসায়ী শতাব্দীর এমন দুজন মনীষার কথা আলোচনা করবো, যারা কেবল ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হননি, উপরন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের সামাজিকসহ মৌলিক আদর্শ-প্রচার করে দাস ও দরিদ্রদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এঁদের একজন হলেন হযরত শেখ ইউসূফ (রঃ) [সপ্তদশ শতাব্দী] এবং অন্যজন হযরত তুয়ান গুরু (রঃ) [অষ্টাদশ শতাব্দী]। দক্ষিণ আফ্রিকায় সমকালে দাসমুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁদেরকে পুরোধা হিসেবে দেখা যায়।

হযরত শেখ ইউসূফ (রঃ) [১৬২৬-১৬৯৯]

শেখ ইউসূফ (রঃ) গোয়ার ম্যাকাসসারে জন্মগ্রহণ করেন ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দে। তিনি আবেদীন তাদিয়া জোসেফ (Abadin Tadia Tjoessoep) বলেও পরিচিত। তাঁর জন্ম অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তিনি গোয়ার রাজা বিসেফ-এর মামাতো ভাইয়ের পুত্র। কতিপয় কামেল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সৌদি আরবে তিনি শিক্ষা লাভ করেন।

ওলন্দাজরা ম্যাকাসসার দখল করে নেওয়ায় শেখ ইউসূফ শিক্ষা শেষে স্বদেশে ফেরত আসতে পারেন নি। তারা তাঁর প্রত্যাবর্তন অসম্ভব করে তুলেছিল। তাই ১৬৬৪ ঈসায়ী সনে জেদ্দা থেকে সমুদ্র পথে রওয়ানা হয়ে তিনি গোয়ায় না গিয়ে পশ্চিম জাভায় বানতেন-এ গিয়ে উঠেন। ইহজীবনে আর কোন দিন স্বদেশ ভূমি গোয়ায় যাওয়া তাঁর হয়ে উঠেনি। বানতেনের সুলতান এ্যাগেংগ স্বীয় কন্যাকে শেখ ইউসূফের সাথে বিয়ে দেন এবং তাঁকে প্রধান ধর্মীয় বিচারক (দ্বীনি হাকিম) ও স্বীয় ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন।

১৬৮০ ঈসায়ী সনে বানতেনে সুলতান এ্যাগেংগের ছেলে প্যানগেরন হাজীর নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সম্ভবতঃ ওলন্দাজরাই এ বিদ্রোহের উস্কানী দেয়। ১৬৮৩ সনের মধ্যে সুলতান এ্যাগেংগ জনগণের প্রভূত সমর্থন আদায়ে সমর্থ হন এবং পুত্র প্যানগেরন হাজীকে তাঁর সোয়ে দে সোয়েয়াং দুর্গে অবরুদ্ধ করে রাখেন। প্যানগেরন হাজী বাটাভিয়ায় ওলন্দাজদের সাহায্য প্রার্থনা করে। ওলন্দাজরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। সুলতান এ্যাগেংগ পরাজিত হন। তবে পাঁচ হাজার জনের একটা দল নিয়ে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই পাঁচ হাজার জনের মধ্যে ১৩০০ জন ছিলেন সৈন্য। তাদের মধ্যে ছিলেন ৫৭ বছর বয়স্ক সুলতান ইউসূফ এবং তাঁর দুই পুত্র পুরবায়া ও কিদুল।

ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চলাকালে বহু লোক আত্মসমর্পনের চেয়ে বরং অনাহারে মৃত্যুবরণকে শ্রেয় মনে করেন। শেখ ইউসূফ এবং পুরবায়া আবার পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁরা তাঁদের প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। ১৬৮৩ ঈসায়ী সনে এক তীব্র যুদ্ধে শেখ ইউসূফ আহত হন। তবে আবার পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি ম্যাকাসসারের পথে চেরিবনে পালিয়ে যান। লেঃ ঈজগেল তাঁদের উপর চড়াও হয় এবং পুরোপুরিভাবে তাঁদেরকে হটিয়ে দেয়। আহত শেখ ইউসূফ আবার পালিয়ে যান এবং একটা ক্ষুদ্র গ্রামে আশ্রয় নেন। তিনি এখানে সম্পূর্ণ একাকী বসবাস করতে থাকেন। তাঁর সর্বদা আশংকা ছিল এই যে, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে পারেন। ইতোমধ্যে তাঁর সঙ্গী-সাথীর সংখ্যা মাত্র ২৪ জনে নেমে আসে। এদের মধ্যে ছিলেন চারজন মহিলা ও অধিকাংশই মোল্লা-মওলানা।

১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে শেখ ইউসূফ ক্ষমার শর্তে আত্ম সমর্পণে রাজী হন। কিন্তু ওলন্দাজরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। তারা তাঁকে বাটাভিয়ার দুর্গে আটকে রাখে। ওলন্দাজদের অবশ্য আশংকা ছিল যে, তিনি আবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। তাই তারা তাঁকে সিলোনে (বর্তমান শ্রীলংকা) কলম্বোর এক দুর্গে কড়া প্রহরায় পাঠিয়ে দেয়। কলম্বোয় কারাবন্দী থাকা অবস্থায় গোয়ার রাজা তাঁকে মুক্তি দানের অনুরোধ জানান এই বলে যে, তাঁর পবিত্র উপস্থিতি এবং নির্দেশনার প্রয়োজন পড়ছে। ইতোমধ্যে শেখ ইউসূফ 'ক্রামত' বা দরবেশ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন। বিশেষ করে তাঁর প্রতিরোধ সংগ্রামের

কারণে তিনি সবার কাছে এই অভিধায় শ্রদ্ধাস্পদ হয়ে উঠেন। কিন্তু গোয়ার রাজার অনুরোধ রাখা হয়নি। ওলন্দাজরা ভয় করছিল যে, তাঁকে উদ্ধারের জন্য হয়তো সশস্ত্র প্রয়াস চালানো হতে পারে। তারা তাঁকে ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭ জুন সুদুর দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে পাঠিয়ে দেয়।

সমুদ্র পথে উত্তমাশা অন্তরীপে যাবার পথে অনেক রহস্যজনক ঘটনা ঘটে। সুপেয় পানি ফুরিয়ে যায় এবং উপকূল থেকে অনেক দূরে হওয়ায় নৌযানের যাত্রীরা দারুনভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে। শেখ ইউসুফ এ কথা শোনার পর তাঁর এক পা সমুদ্রে স্থাপন করেন এবং ঐ স্থানে তাদের পানির পিপাগুলো ডুবিয়ে ধরতে বলেন। পিপাগুলো তোলার পর তারা বিস্ময়ের সাথে দেখলো যে, এ পানি একদম তাজা ও সুপেয়। এই কারামতের কথা এখনো এখানে লোকমুখে প্রচলিত আছে। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থাশীল অনুসারীরা এই কারামতের কথা গর্বসহকারে বর্ণনা করেন।

শেখ ইউসুফ যখন উত্তমাশা অন্তরীপে এসে পৌঁছান, তখন গভর্নর সাইমন ফন্ দার স্টেল তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানান। তাঁর ইন্দোনেশীয় পটভূমির কারণে তিনি ও তাঁর ৪৯ জন অনুসারীকে কেপটাউন থেকে বেশ দূরে পুনর্বাসন করা হয়। তাঁদেরকে ঈরেস্তে নদীর মোহনার নিকটবর্তী যান্দভিলা গ্রামে বসবাস করতে দেয়া হয়। এ এলাকা এখন ম্যাকাসসার নামে পরিচিত। তিনি ও তাঁর দলের জন্য কেপটাউন কর্তৃপক্ষ ১২ রিক্স ডলার ভাতা প্রদান করে। যান্দভিলায় শেখ ইউসুফের বসতি শীঘ্রই পলাতক দাসদের অভয়াশ্রম হয়ে উঠে। এখানেই দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বপ্রথম সংহত মুসলিম জনবসতি গড়ে উঠে। বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠা এই প্রথম মুসলিম জনবসতি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল। এখান থেকেই কেপটাউনের দাসদের কাছে ইসলামের মহান উদার মুক্তির বাণী গিয়ে পৌঁছে। ১৬৯৯ খৃস্টাব্দের ২৩ শে মে হযরত শেখ ইউসুফ (রঃ) ইন্তেকাল করেন। ম্যাকাসসারের কাউরের পাহাড় শীর্ষে তাঁর মাজার শরীফ বিদ্যমান। এই মাজার শরীফ এখন পুণ্যার্থীদের পবিত্র জিয়ারত গাহ। মুক্তি ও কল্যাণের অন্বেষায় এখন এখানে প্রতিনিয়ত অগণিত লোক সমাগম ঘটে।

হযরত তুয়ান গুরু (রঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রথম আবির্ভাব ঘটান যিনি, তিনি তুয়ান গুরু হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে কাদু আবদুস সালাম।

তুয়ানগুরু মরক্কোর সুলতানের বংশধর। তিনি ত্রিনেট দ্বীপের টিদোরের যুবরাজ। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ হানাদাররা উত্তমাশা অন্তরীপে হানা দেয়। তুয়ানগুরু এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ওলন্দাজরা তাঁকে নির্বাসন দেয় এবং ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর রব্বেনদ্বীপে তাঁকে আটক করে রাখে।

বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার পর হযরত তুয়ানগুরু (রঃ) খাদিজা ভন দ্য কাপ নামী এক মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই পুত্র ছিল, নাম আবদুর রাকিয়েপ ও আবদুর রউফ। তিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন এবং রব্বেন দ্বীপে আটক অবস্থায় তিনি তাঁর কয়েক কপি কুরআন মুখস্ত লিখেন। তাঁর লিখা কুরআন শরীফের কপিগুলোই সম্ভবতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম লিখিত কুরআন। তাঁর লিখিত কুরআন শরীফগুলোর দু'কপি এখনো সুরক্ষিত আছে; এককপি রয়েছে ডর্প স্ট্রীট মসজিদ, বু-কাপ-এ। অপরটি রয়েছে তাঁর একজন উত্তরাধিকারীর জিম্মায়। তিনি ইসলামী আইন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকও রচনা করেন। এই পুস্তকটি উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বরিত হয়।

হযরত তুয়ানগুরু (রঃ) জেল খানা থেকে মুক্তি লাভের পর থেকে কেপটাউনের ডর্প স্ট্রীটে বসবাস করতে থাকেন এবং একটি মাদ্রাসা চালু করেন। ত্রিজন ভন দার কাপ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ডর্প স্ট্রীট মাদ্রাসা নামের এই মাদ্রাসাটি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসায় তিনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কৃষ্ণাঙ্গ ও আরব দাসদেরকে শিক্ষা দান করতেন। 'তুয়ানগুরু' শব্দের অর্থ হল "সম্মানিত শিক্ষক"। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার আদলে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আরো ১২টি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তুয়ানগুরু শিয়াপ্পিনি স্ট্রীটের একটি অব্যবহৃত বাড়ীতে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে জুমার নামাজের আয়োজন করেন। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে ডর্প স্ট্রীপ মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে প্রাথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এমন এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন যখন দেশটাতে ইসলাম নিষিদ্ধ ছিল। উল্লেখ, ১৮০৪ সন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামী বিধান অনুসরণ করা ফৌজায়ারী দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল।

তুফানগুরু বু-কাপস্থ লংমার্কেট স্ট্রীটে তানা বারু কবরস্থানে সমাহিত হন।

তাসাওউফে ইসলামীর অনুশীলনের অপরিহার্যতা

● মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান ●

সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের সঠিক পথে হেদায়ত করেছেন, যিনি দিশেহারা মানব সন্তানদের সত্য পথের সন্ধান দেয়ার জন্য আওলিয়ায়ে কেরামকে সুউজ্জল প্রদীপ বানিয়েছেন, যাঁদের ব্যাপারে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেছেন, অতএব তোমরা তাঁদের পথ অনুসরণ কর" (সূরা আন'আম: ৯০)

লাখ কোটি সালাম প্রেরণ করছি নবীকুল শিরোমনি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব আমাদের প্রিয় নবীজী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর পবিত্র দরবারে আকদসে এবং সাথে তাঁর পরিবারবর্গ বংশধর, সাহাবায়ে কেরাম এবং সমস্ত উম্মতের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর অনুসরন করবে।

"আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে রাখবেন যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের ইবাদতে রত তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণ বিমুখ করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে আপনি তার অনুসরণ করবেন না।" (সূরা কাহফ: ২৮)

উক্ত আয়াতটি আসহাবে সুফ্ফার প্রশংসা সুচক। সাহাবায়ে কেরামের একটি দল সর্বদা নবীয়ে করিম (দঃ) এর সান্নিধ্যে থাকতেন, তাঁরা মসজিদে নববী শরীফে অবস্থান করতেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁদের অবস্থানের জন্য মসজিদের ভিতরে একটু পিছনের দিকে কিছু জায়গা নিদিষ্ট করেছেন, তথায় তাঁরা ইবাদত রেয়াজতে নিমগ্ন থাকতেন, অধীর আগ্রহে হুজুর (দঃ) সব সময় তাঁদের খোঁজ খবর নিতেন, দুনিয়াদারীর প্রতি তাঁদের কোন আসক্তি ছিলনা। ধন সম্পদের প্রতি কোন মোহ-মায়া ছিলনা। এমন কি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও তাঁদের কোন ব্যতিব্যস্ততা ছিলনা, দরবারে নববী শরীফ হতে যা তাঁদের জন্য দেয়া হত, তা তাঁরা সন্তুষ্টচিত্তে আহার করতেন, তাঁরা সদা সর্বদা আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমে বিভোর থাকতেন, আবার যখন যুদ্ধ করার আহ্বান আসত, তাঁরাই সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য। তাঁরা পবিত্র কুরআনে করিমের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও রাসূলে করিম (দঃ) এর পবিত্র আদর্শ অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁরা এক অনাড়ম্বর নির্বিলাস জীবন যাপন করতেন, তাঁরা ন্যূনতম প্রয়োজন ব্যতিরেকে কখনো বাইরে যেতেন না এবং অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করতেন না, তাঁদের চাওয়া পাওয়া ছিল আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের (দঃ) সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়া। তাঁদের এই দুনিয়াবিমুখীতা, কৃচ্ছ্রতা সাধন আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয়েছে তাই তাঁদের প্রশংসা সুচক আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। মূলত তাঁরাই প্রথম সূফি সম্প্রদায়। হুজুর নবীয়ে করিম (দঃ) এর পবিত্র হায়াতে জিন্দেগী হচ্ছে তাসাওউফে ইসলামীর সুচনা। যে আধ্যাত্মিক জীবন সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (দঃ) এর প্রকৃত অনুসরণের মাধ্যমে অর্জন করেছেন তাই তাসাওউফে ইসলামীর ভিত্তি। তাসাওউফ হচ্ছে দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা ঐচ্ছিক নয়। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা একান্ত অপরিহার্য। দ্বীনের ভিত্তি তিনটি: ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। হুজুর (দঃ) এ তিনটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এক ছদ্মবেশী আগন্তুককে যিনি সমবেত সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে এসে অত্যন্ত বিনয় নম্রতার সাথে উক্ত বিষয় সমুহের ব্যাপারে জানতে চাইলেন, এবং তিনি প্রস্থান করার পর নবী করিম (দঃ) বললেন আগন্তুক কে তোমরা চিনতে পেরেছ, সমবেত সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে 'না' বললে তিনি (দঃ) বললেন তিনি জিব্রাঈল (আঃ), তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছেন। অতএব দ্বীন হচ্ছে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের সমষ্টি। ইসলাম হচ্ছে আনুগত্য ও ইবাদত, ঈমান হচ্ছে আক্বিদা বিশ্বাস, আর ইহসান হচ্ছে মোরাকাবা মোশাহেদা। এভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ, আর তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। তাই এ তিনটির সমন্বয়েই দ্বীনের ভিত্তি, এর কোন একটি ব্যতীত দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

তাসাওউফে ইসলামী দ্বীনের রূহ, আল্লাহ তা'আলার উপলব্ধি ও তাঁর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে এক কার্যকরী পদ্ধতি যার মৌলিক উপাদান হচ্ছে নবীয়ে করিম (দঃ) এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জীবনাদর্শ আর নবীয়ে করিম (দঃ) এর পবিত্র হায়াতে জিন্দেগী হচ্ছে জীবন্ত কুরআন।

কবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল জুর নবীয়ে করিম (দঃ) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। তনি উত্তরে বলেন,

"তাঁর (দঃ) চরিত্র হচ্ছে কুরআন" পবিত্র কুরআনের াস্তব নমুনা হচ্ছে নবীজীর চরিত্র, তাঁর জীবনাদর্শ পবিত্র রআনের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা ইসলামে হাদিস বা ন্নাহ নামে পরিচিত। নবীজী (দঃ) এর আদর্শকে আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন রেছেন সাহাবায়ে কেরাম এবং তৎপরবর্তী তা'বেঈন, াবে তা'বেঈন, আইয়্যিম্মায়ে মুজতাহেদীন, সালফ ালেহীন এবং যুগে যুগে সত্যের পতাকাবাহী প্রকৃত সলমানগণ সর্বোপরি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সর্বোচ্চ াগ তিতিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের এই মূল ধারাকে যাঁরা জাগ্রত রেখেছেন। দিশেহারা মানুষকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ রেছেন, এর প্রচারে যারা দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে গয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন আহলে বা'য়ত রাসূল (দঃ) গণ। াস্তবতার নিরিখে একটু চিন্তা করলে এটা সুস্পষ্ট তীয়মান হচ্ছে যে যারা এই আদর্শের সত্যিকার অনুসারী য়েছেন তাঁরাই সফলকাম হয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ া'আলার প্রিয়ভাজন হয়েছেন এবং দুনিয়ার মানুষের নকট স্মরণীয় বরণীয় হয়েছেন, তাঁরা ইসলামে ওলী আল্লাহ তথা আল্লাহর বন্ধু বা প্রিয়ভাজন নামে সম্যক রিচিত।

তাঁদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং াকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ নিয়ার জীবনে এবং আখেরাতেও। আল্লাহর বাণীর কোন হরফের হয়না। এটাই মহা সাফল্য। (সূরা ইউনুস)

তাঁদের সফলতার সোপান, কর্মপদ্ধতিই হচ্ছে াসাওউফে ইসলামী বা সূফি দর্শন, যা হচ্ছে শরীয়ত ও াকীকতের অপূর্ব সমন্বয় যাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট নঃশর্ত আত্ম সমর্পনের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও আল্লাহর রহস্যময় জগতের অবলোকন ঘটে।

তাসাওউফ হচ্ছে একটি জীবন দর্শন, যা নির্দিষ্ট কিছু র্মপদ্ধতির সমষ্টি যা মানুষ গ্রহণ করে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের রম শিখরে উপনীত হওয়ার জন্য, আত্মার পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য, সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটন করার জন্য এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্য। তাসাওউফ চ্ছে কুরআনের আলোকে উন্নত চরিত্রের অনুশীলন। তাই এর প্রথম পদক্ষেপ অনুপম চরিত্র গঠন। এ দিক থেকে "তাসাওউফ" ইসলামের রূহ বা প্রাণ। কারণ ইসলামী বিধি নিষেধ সমুহ চরিত্র ভিতকে মজবুত করার দিকে নির্দেশ করে। পবিত্র কুরআনে পাকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তিন ধরনের হুকুম আহকাম দিয়েছেন ১। আকায়েদ ২। ফরুয়াত (ইবাদাত মোয়ামেলাত) ৩। আখলাক। প্রত্যেক প্রকারের কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। ১। "আকায়েদ" আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। তিনি সর্বশক্তিমান তিনি স্রষ্টা তিনি একক অদ্বিতীয় তাঁর কোন অংশীদার নাই এ সবের স্বীকারোক্তি প্রদান এবং ফিরিশতা, ঐশী গ্রন্থ সমুহ, রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস ও তাক্বদিরের ভাল মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপনকে সন্নিবেশিত করে। ২। "ফরুয়াত" ইবাদত ও মোয়ামেলাত সম্পর্কিত শরীয়তের হুকুম আহকাম। সে গুলি যাবতীয় ইবাদত বন্দেগী, কাফ্ফারাহ, মান্নত, আর্থিক লেনদেন, পারিবারিক জীবন, অপরাধ ও তার শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত হুকুম আহকামকে শামিল করে। ৩। এরপরে হচ্ছে "আখলাক"। পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের প্রতি বান্দাদের নির্দেশ করে যেমন নির্বিলাস জীবন যাপন দুনিয়ার মোহ মায়া লোভ লালসা পরিত্যাগ করা। ধৈর্য ধারণ করা, সহিষ্ণু হওয়া, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা। তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসা, দৃঢ়তা, ন্যায় পরায়নতা, সাবধানতা, তাকওয়া পরহেজগারী ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের পূর্ণতার জন্য একান্ত আবশ্যক।

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে যে নবীয়ে করিম (দঃ) হচ্ছেন উত্তম আদর্শ তিনিই সমস্ত সৎ ও সুন্দর গুণাবলীর সমাহার। তিনিই চারিত্রিক বৈশিষ্টের পূর্ণতার চরম শিখরে সমাসীন। চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের প্রত্যাশী সকলেই তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য।

মূলতঃ ইসলামী শরীয়তে "আখলাক" বা চারিত্রিক গুণাবলীর অবস্থান আকায়েদ ও ফিকহ এর চাইতে কোন অংশে কম নয়। আর তা শুধু বাহ্যিক চাল চলনে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না এর তাত্ত্বিক উপলব্ধিও প্রয়োজন। যেমন বান্দার যাবতীয় ইবাদত বন্দেগী আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, এখানে শুধুমাত্র গতানুগতিক ভাবে বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা কাম্য নয় তা হতে হবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ এবং বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে

সম্পর্কের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধিও একান্ত জরুরী। আল্লাহর প্রেমে অভিভূত হয়ে ইবাদত করা চাই। বোঝা হিসেবে নয়। এটাই হুজুর নবীয়ে করিম (দঃ) এর শিক্ষা।

নবীয়ে করিম (দঃ) এর পবিত্র জীবনাদর্শ তাসাওউফের অন্যতম উৎস, আর নবীয়ে করিম (দঃ) এর আদর্শ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের নাম ইসলাম। উভয় জাহানে কামিয়াব হতে চাইলে নিষ্ঠার সাথে তাঁর (দঃ) আনুগত্য ও অনুসরণ অপরিহার্য এই মর্মে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে" (সূরা আহযাব: ২১)

(হে হাবীব দঃ) বলুন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু" (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

আর তাসাওউফের ভাষ্য হচ্ছে অনুসরণ যেন গতানুগতিক বা লোক দেখানো সুনাম অর্জনের লক্ষ্যে না হয়। তা যেন নিষ্ঠা আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে হয়।

তাসাওউফ মানুষকে একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে ইবাদত রেয়াজত করতে উৎসাহিত করে। নফল তথা ইবাদত ও সৃষ্টির কল্যাণের মাধ্যমে মহান প্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে উদগ্রীব করে। রাসূলুল্লাহ (দঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ আওলিয়ায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও ভালবাসতে শেখায় আচার ব্যবহারে বিনয় নম্র হতে শেখায়, লেন-দেন, কাজ-কারবারে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারীতা ও দায়িত্ববোধ অবলম্বন করতে বাধ্য করে। অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে শেখায় সর্বক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ন সংযমী সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হতে শেখায়। নিজকে সার্বক্ষণিক আল্লাহ পর্যবেক্ষণে এবং তাঁর স্মরণে রত থাকতে শেখায়।

সর্বোপরি তাসাওউফ "হক্কুল্লাহ" ও "হক্কুল ইবাদ" তথা ধর্মীয় ও সামাজিক দায় দায়িত্ব যথাযথ পালন পূর্বক সত্যিকার অর্থে একজন পূর্ণ ইমানদার হতে শেখায়। তাসাওউফ হচ্ছে সূরা ফাতেহার "সিরাতুল মোস্তাকিম" যা আমরা প্রত্যহ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি। এই আলোচনা ইহাই প্রমাণ করে যে একজন মুসলমানের ক্ষেত্রে তাসাওউফ অলম্বন করা অপরিহার্য।

সূফি উদ্ধৃতি

■ যে লোক কারও কয়েদখানায় আবদ্ধ নহে এবং তার কয়েদখানায় অন্য কেউই আবদ্ধ নয় সেই-ই হল প্রকৃত সূফি।

■ মারিফাত বা আধ্যাত্মবাদ সাধারণ কতগুলি নিয়ম পালন বা শুধু কিতাবী ইলমে অর্জিত হয় না। মূলতঃ মারিফাত বা তাসাওউফ হল এক আখলাক্বী বস্তু। স্বভাব ও প্রকৃতি অবলম্বন দ্বারাই তা অর্জিত হয়।

– হযরত আবুল হাসান নূরী বাগদাদী (রাহ্)

■ যে ব্যক্তি রিপুর লালসাকে দমন করতে অক্ষম, সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল। আর যে ব্যক্তি রিপু দমনে সক্ষম সে হল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

■ দরবেশদের আল্লাহর উপরই ভরসা যথেষ্ট। পক্ষান্তরে ধনীদের নির্ভরতা হল ধনের উপর।

■ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে ইজ্জতের আশা রাখে, সে ইজ্জত লাভের বদলে বে'ইজ্জত হয়ে যায়।

–হযরত ইব্রাহীম ইবনে দাউদ রুক্কী (রাহ্)

■ আরিফদের থেকে সকল পরদা তুলে দেয়া হয় এবং আরিফ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার গুপ্ত রহস্যের মর্ম জানে।

–হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহ্)

ইক্বামতের শব্দাবলী ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

● বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর ●

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরূদ ও সালাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আল-আসহাব সকলের তরে, তাহিয়্যাহ-অভিবাদন আল্লাহর প্রিয়ভাজন আওলিয়াদের প্রতি নিবেদিত।

الصلوٰة والسّلام عليك يا سيّدى يا رسول الله

وعلىٰ اٰلك واصحابك واتباعك يا سيّدى يا حبيب الله

আমাদের জানা মতে এ দেশের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নী-হানাফী। এখানে আযান, ইক্বামত, নামায, রোযা ইত্যাদি হানাফী মাযহাবেরই রীতি-নীতি অনুসারে পালিত হয়। হানাফী মাযহাবের ফিক্হ-ফতওয়ার কিতাবাদিই মকতব-মাদ্‌রাসায় পঠন-পাঠন চলে। কোন ব্যক্তি যদি অন্য তিন মাযহাবের কোন একটির অনুসারী পরিচয়ে আপন মাযহাব মতে ধর্ম-কর্ম পালন করে, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। পরন্তু হানাফী মাযহাবের কোন রীতি-পদ্ধতির বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হলে, এ সবকে কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী আখ্যায়িত করা হলে, একজন নিষ্ঠাবান হানাফী নীরব থাকতে পারেনা।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, অতিসম্প্রতি এক দিকভ্রান্ত মাইকের স্পীকারে বলে বেড়াচ্ছে, 'ইক্বামতের শব্দ হাদীসে এগারটিই আছে, সতেরটি নয়; দুই পাতার মৌলভীদের ইক্বামতের জ্ঞানও নেই'। তার এ বক্তব্যে হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীস সম্পর্কীয় জ্ঞানও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। বস্তুতঃ ওই অভাগা যদি অন্য তিন মাযহাবের কোন একটির অনুসারী হতো, তবে এ রূপ বাক্য আওড়াতে পারতনা। জানি না, সে অবশেষে আহলে হাদীস নামে হাদীস অস্বীকারকারী ফির্কায় নাম লিখাল কিনা। সুন্নী-হানাফীর ছদ্মাবরণে সাধারণ জনতাকে ধোঁকা দেওয়ার ওই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে এ ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে ইমামগণের দৃষ্টিতে হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মর্যাদা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি; যাতে ওই নব্য লামাযহাবী তিন মাযহাবের কোন একটির অনুসারী দাবীতে আহলে হক্ব পরিচয়ে প্রতারণার সুযোগ না পায়। অতঃপর ইক্বামতের শব্দাবলী সতেরটি হওয়ার পক্ষে বিস্তারিত প্রমাণাদি হদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লামা'র আলোকে উপস্থাপন করবো, যাতে তার দাবীর অসারতা প্রমাণের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লামা'র ওপর মিথ্যারোপের বিষয়টিও উদ্ঘোচিত হয়।

ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত: এক. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরীস আশ্ শাফি'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

الناس كلّهم عيال على ابى حنيفة فى الفقه وفى رواية ماطلب احد الفقه الا كان عيا لا على ابى حنيفة

'প্রত্যেক মানুষ ফিক্হ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রে আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র পোষ্য তথা মুখাপেক্ষী'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'ইমাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া কেউ ফিক্হশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেনি'। *(আবুল কাসিম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ইহইয়া বিন হারিস আস্ সা'দী পরিচিত নাম: ইবনি আবীল আওয়াম, ইন্তিকাল: ৩৩৫ হিজরী রচিত ফদ্বায়িলু আবী হানিফাতা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু ৮৭ পৃষ্ঠা, আবুল মাওয়াহিব আবদুল ওহ্হাব বিন আহমদ বিন আলী বিন আহমদ আশ্শাফি'ঈ, আল মিসরী, আশ্ শা'রানী, ইন্তিকাল: ৯৭৩ হিজরী রচিত আলমিযানুল কুব্‌রা, প্রথম খণ্ড ৭৫ ও ৭৭ পৃষ্ঠা)*

দুই. ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

ماتقولون فى رجل لوناظرنى فى ان نصف هذه الاسطونة حجر ونصفها ذهب او فضه لقام بحجته

'এমন ব্যক্তির বিষয়ে তোমরা কী বল যে, যিনি এ স্তম্ভের অর্ধেক পাথর আর অর্ধেক স্বর্ণ বা রুপা- এ বিষয়ে আমার সাথে বিতর্ক করলে তবে অবশ্যই প্রমাণ দ্বারা তা প্রতিষ্ঠা করবেনই'। *(আল্ মিযানুল কুবরা ১ম খণ্ড, ৭৫ ও ৭৭ পৃষ্ঠা)*

উক্ত দুই ইমাম যখন ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এরূপ উন্নত মন্তব্য করেছেন, সুতরাং অনুসারীদের জন্য তাঁদের অনুসরণে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনই আবশ্যক। ইমাম শাফি'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র উক্তি মতে পুরো দুনিয়া ফিক্হ শাস্ত্র বুঝার জন্য যার মুখাপেক্ষী, ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মন্তব্য মর্মে যার বক্তব্য আপাত দৃষ্টিতে উল্টো মনে হলেও জোরালো দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; সে মহান ইমাম যদি ইক্বামতের শব্দাবলী

সত্তেরটি বলেন, আর তা হাদীসে থাকবেনা কিংবা হাদীসের বিপরীত হবে, এমন কি হতে পারে? ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বলবেন, না এমন হতেই পারেনা; বরং এরূপ প্রলাপের প্রবক্তাই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে পূর্ণ মূর্খ। মোটা অংকের টাকার লোভে লামাযহাবী না বললে কিংবা প্রসিদ্ধির মোহে প্রলাপ বকার প্রবণতা পেয়ে না বসলে ইক্বামতের শব্দাবলী সত্তেরটি হাদীসে খুঁজে পেতে কিংবা ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ওপর আস্থা রেখে হাদীসে আছে বিশ্বাস করতে মোটেও বেগ পেতে হতোনা। হাদীস শরীফে কী আছে, কী নেই, মন্তব্যের মাধ্যমে বড় মুহাদ্দিস রূপে আত্মজাহিরের অপপ্রয়াস; তা-ও আবার ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অভিমতকে আক্রান্ত করে, চরম অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। এতে প্রসিদ্ধি অর্জিত হবে বটে, তবে বড় মুহাদ্দিস রূপে নয়, মস্ত মূর্খ হিসেবেই। সেকি ছার? ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র তুলনায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলায়হিও ছাত্র তুল্য। আল্লামা শা'রানী রাহমতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

إن فخر الرازى بالنسبة إلى الامام أبى حنيفة كطالب العلم او كاحاد الرعية مع السلطان الأعظم او كاحد النجوم مع الشمس كما حرم العلماء على الرعية الطعن على إمامهم الأعظم إلابدليل واضح كالشمس فكذلك يحرم على المقلدين الاعتراض والطعن على ائمتهم فى الدين إلا بنص واضح لايحتمل التأويل

অর্থাৎ 'নিশ্চয় ফখরুদ্দীন রাযী ইমাম আবু হানিফার তুলনায় ছাত্র সদৃশ অথবা মহান সম্রাটের সাথে সাধারণ প্রজাবৎ অথবা সূর্যের সামনে একটি তারকা রূপ। যেমনিভাবে ওলামাগণ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রমাণ ছাড়া মহারাজের ওপর অপবাদ- দোষারোপ প্রজার জন্য হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তেমনি একজন অনুসারীর জন্য ব্যাখ্যার অবকাশমুক্ত সুস্পষ্ট দলীল ছাড়া আইম্মায়ে দ্বীনের ওপর আপত্তি উত্থাপন ও অপবাদারোপ হারাম'। *(আল মিযানুল কুবরা, ১ম খণ্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)*

ইক্বামতের শব্দাবলী: এবার ইক্বামতের শব্দাবলী প্রসঙ্গে আসা যাক। এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

এক. ইক্বামতের শব্দাবলী প্রসঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র তিনটি মত রয়েছে। যথা– আটটি (অপ্রচলিত), দশটি (প্রাচীন) ও এগারটি (প্রসিদ্ধ); শেষোক্তটিই তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং তাঁর অনুসারীদের মাঝে বর্তমান প্রচলিত।

দুই. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। যথা– সত্তেরটি (অপ্রসিদ্ধ বর্ণনায়), এগারটি; শেষোক্ত উক্তিই তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং তাঁর অনুসারী জগতে প্রচলিত।

তিন. ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মতে ইক্বামতের শব্দাবলী দশটি।

চার. ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ইমাম ইবনুল মুবারক, ইমাম সুফিয়ান সওরী ও ইমাম ইব্রাহীম নখ'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম'র মতে ইক্বামতের শব্দাবলী সত্তেরটি।

মোটকথা বর্তমান বিশ্বে চার মাযহাবের অনুসারীরা দশ, এগার ও সত্তের শব্দে ইক্বামত বলেন। নিম্নে ওই শব্দাবলী বিবৃত হল।

ক. ১. আল্লাহু আকবর, ২. আল্লাহু আকবর, ৩. আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ৪. আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ৫. হাইয়া আলাস্ সালাহ, ৬. হাইয়া আলাল ফালাহ, ৭. ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাত, ৮. আল্লাহু আকবর, ৯. আল্লাহু আকবর, ১০. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (মালেকী মাযহাব অনুসারে প্রচলিত ইক্বামতের শব্দাবলী)

খ. ১. আল্লাহু আকবর, ২. আল্লাহু আকবর, ৩. আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ৪. আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ৫. হাইয়া আলাস্ সালাহ, ৬. হাইয়া আলাল ফালাহ, ৭. ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাত, ৮. ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাত, ৯. আল্লাহু আকবর, ১০. আল্লাহু আকবর, ১১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে প্রচলিত ইক্বামতের শব্দাবলী)

গ. ১. আল্লাহু আকবর, ২. আল্লাহু আকবর, ৩. আল্লাহু আকবর, ৪. আল্লাহু আকবর, ৫. আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ৬. আশাহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ৭. আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ৮. আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ৯. হাইয়া আলাস্ সালাহ, ১০. হাইয়া আলাস্ সালাহ, ১১. হাইয়া আলাল ফালাহ, ১২. হাইয়া আলাল ফালাহ, ১৩. ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাত, ১৪. ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাত, ১৫. আল্লাহু আকবর, ১৬. আল্লাহু আকবর, ১৭. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (হানাফী মাযহাব মতে প্রচলিত ইক্বামত)

ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অভিমতের পক্ষে দলীল: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة

'অতএব বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দেওয়া হল

যে, আযানকে জোড় (দুই দুইবার) এবং ইক্বামতকে বিজোড় (একবার) করতে'। *(বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড, তৃতীয় পারা, কিতাবুল আযান, বাবু বদয়িল আযানি, বাবুল আযানি মাছনা মাছনা - ৮৫ পৃষ্ঠা; সুনানুন্ নাসাঈ, ১ম খণ্ড, কিতাবুল আযানি, বাবু তাছনিয়াতিল আযানি ৭৩ পৃষ্ঠা; তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, বাবু মা জাআ ফী ইফরাদিল ইক্বামাতি, ৪৮ পৃষ্ঠা; মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড, কিতাবুস সালাতি, বাবুল আমরি বিশাফ'ইল আযানি ওয়া ইতারিল ইক্বামাতি ইল্লা কালিমাতান ফাইন্নাহা মুছান্নাতান ১৬৪ পৃষ্ঠা, ৭৪৩ ও ৭৪৫ নং হাদীস; মিশকাতুল মাসাবীহ ৬৩ পৃষ্ঠা)*

ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মতের পক্ষে দলীল: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة الا الاقامة

'হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আদিষ্ট হলেন যে, আযানকে জোড় (দুই দুইবার) এবং ইক্বামতকে 'ক্বাদকামাতিস সালাত' ব্যতীত বিজোড় (একবার) করতে'। *(বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা; মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা, ৭৪২ নং হাদীস; মিশকাতুল মাসাবীহ ৬৩ পৃষ্ঠা)*

ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অভিমতের পক্ষে দলীল: হযরত ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অভিমত যেহেতু জনৈক আহম্মক কর্তৃক আক্রান্ত, সেহেতু এ প্রসঙ্গে ব্যাপক প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়াস পেলাম।

এক.

عن ابى محذورة ان النبى صلّى الله عليه وسلم علّمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة

'হযরত আবু মাহযূরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা তাকে আযান শিখিয়েছেন উনিশ শব্দ এবং ইক্বামত সতের শব্দ'। *(মিশকাতুল মাসাবীহ ৬৩ পৃষ্ঠা; ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ইন্তিকাল ২৭৯ হিজরী সংকলিত জামিউত্ তিরমিযী ১ম খণ্ড ৪৮ পৃষ্ঠা; ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশ্'আছ সিজিস্তানী, ইন্তিকাল ২৭৫ হিজরী, সুনানে আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠা; সুনানে নসাঈ ১ম খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠা; মসনদে আহমদ; সুনানে দারমী; সুনানে ইবনে মাজাহ)*

উল্লেখ্য যে, ইক্বামতের শব্দাবলী তখনই সতেরটি হবে, যখন ইক্বামতও আযানের ন্যায় দুই দুইবার বলা হবে।

দুই. আবু মাহযূরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, علمنى رسول الله صلّى الله عليه وسلم الاقامة سبع عشرة كلمة

'আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা ইক্বামত শিক্ষা দিয়েছেন সতের শব্দ'। (শরহি মা'আনীয়িল আসারি, ১ম খণ্ড, কিতাবুস সালাতি, বাবুল ইক্বামাতি কায়ফা হিয়া)

তিন. عن عبد الله بن زيد قال كان اذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا فى الاذان والاقامة

'হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়িদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা'র যুগে আযান-ইক্বামত (উভয়ের শব্দাবলী) জোড় জোড় (দুই দুইবার) পড়া হত'। *(তিরমিযী শরীফ ১ম খণ্ড ৪৮ পৃষ্ঠা)*

চার.

عن عبد الرّحمن بن ابى ليلىٰ قال اخبرنى اصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصارى رأى فى المنام الاذان والاقامة فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال علمه بلا لا فاذّن مثنىٰ مثنىٰ واقام مثنىٰ مثنىٰ وقعد قعدة

'হযরত আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা'র সাহাবীগণ সংবাদ দেন যে, নিশ্চয় আবদুল্লাহ বিন যায়িদ স্বপ্নে (ফিরিশতাকে) আযান দিতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা'র দরবারে এসে সংবাদ দিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা বলেন, তুমি বিলালকে তা শিখিয়ে দাও। অতএব দুই দুই শব্দে তিনি (বিলাল) আযান ও ইক্বামত দেন এবং উভয়ের মধ্যখানে স্বল্পক্ষণ বসেন'। *(ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী, ইন্তিকাল ৩২১ হিজরী, শরহি মা'আনীয়িল আসার ১ম খণ্ড, কিতাবুস সালাত, বাবুল ইক্বামাতি কায়ফা হিয়া, ৯৪ পৃষ্ঠা)*

পাঁচ. ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সনদে ইবনে আবু লায়লা হতে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা নামাযের জন্য মুসলমানদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে উদ্যোগ করছেন, তখন একজন আনসারী সাহাবী তাঁর খেদমতে এসে আরয করলেন,

يارسول الله انى لمارجعت لما رايت من اهتمامك رايت رجلا كان عليه ثوبين اخضرين فقام على المسجد فاذّن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها الا انه يقول قد قامت الصلوٰة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اراك الله خيرا فمر بلا لا فليؤذن

'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী

ওয়াসাল্লামা! যখন আমি আপনাকে নামাযের নির্দিষ্ট সময়ে মানুষদের একত্রিত করার পদ্ধতি নিয়ে আগ্রহী দেখে ঘরে ফিরলাম, তখন সবুজ দু'টি কাপড় পড়া এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলাম। ওই ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে আযান দিল অতঃপর কিছুক্ষণ বসল। তারপর আবার দাঁড়িয়ে আযানের মত বলল এবং শেষ দিকে ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাতও বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা বললেন, আল্লাহ তোমাকে ভাল স্বপ্ন দেখিয়েছেন। যাও বিলালকে তা বলে আযান দিতে বল'। *(সুনানে আবু দাউদ ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা; সুনানে কুবরা ১ম খণ্ড ৩৯১ পৃষ্ঠা)*

ছয়. তাহাবী, মুসান্নফি ইবনি আবী শায়বা ও অন্যান্যদের বিভিন্ন বর্ণনা মতে সাব্যস্ত যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়িদকে স্বপ্নে আযানের সাথে ইক্বামতও শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তা আযানের ন্যায় দুই দুই শব্দে ছিল। এ ধারাবাহিকতায় সর্বাধিক স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ বর্ণনা মুসান্নফি ইবনি আবী শায়বা-এ বর্ণিত,

حدّثنا ابو عبد الرحمٰن بقی بن مخلد قال نا ابو بکر بن ابی شیبة قال نا وکیع قال نا الاعمش عن عمرو بن مرّة عن عبد الرحمٰن بن ابی لیلی قال نا اصحاب رسول الله صلّی الله علیه وسلّم انّ عبد الله بن زید الانصاری جاء الی النبی علیه السلام فقال یارسول الله رایت فی المنام کان رجلا قام وعلیه بردان اخضران علی حدبة حائط فاذّن مثنیٰ واقام مثنیٰ وقعد قعدة قال فسمع ذلك بلال فقام فاذّن مثنیٰ مثنیٰ واقام مثنیٰ مثنیٰ وقعد قعدة

অর্থাৎ 'আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা'র সাহাবীগণ সংবাদ দিয়েছেন যে, নিশ্চয় আবদুল্লাহ বিন যায়িদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামার নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি যেন বাগানের পিঠে দাঁড়াল এবং তার গায়ে সবুজ দু'টি চাদর রয়েছে। অতঃপর সে দুই দুই শব্দে আযান ও ইক্বামত দিল এবং উভয়ের মধ্যখানে কিছুক্ষণ বসল। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওটা (স্বপ্নবৃত্তান্ত) শুনে দাঁড়িয়ে দুই দুই শব্দে আযান ও ইক্বামত দিলেন এবং উভয়ের মধ্যখানে অল্পক্ষণ বসলেন'। *(মুসান্নফি ইবনি আবী শায়বা ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)*

সাত. হাফিয ইবনি আবী শায়বা আপন সনদে বর্ণনা করেন, كان عبد الله بن زید الانصاری یؤذن النبی صلّی الله علیه وسلّم یشفع الاذان والاقامة

হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়িদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা'র সম্মুখে আযান দিতেন এবং আযান ও ইক্বামত উভয়ের শব্দাবলী (শাহাদতায়ন হাইয়ালাতায়ন) দুই দুইবার বলতেন'। *(হাফিয আবু আব্দিল্লাহ ইবনি আবী শায়বা ইন্তিকাল ২৩৫ হিজরী, মুসান্নফি ইবনি আবী শায়বা, ১ম খণ্ড ১৩৮ পৃষ্ঠা)*

আট. তিনি আরো বর্ণনা করেন,

ان بلالا کان یثنی الاذان والاقامة 'হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আযান ও ইক্বামতে শব্দাবলী দুই দুইবার বলতেন'। *(প্রাগোক্ত)*

নয়. হযরত সুওয়াইদ বিন গাফলাহ বলেন,

سمعت بلالا یؤذن مثنیٰ مثنیٰ ویقیم مثنیٰ 'আমি বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে আযান ও ইক্বামতে শব্দাবলী দুই দুইবার বলতে শুনেছি'। *(শরহি মা'আনীয়িল আসার ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা)*

দশ. সুনান-এ দার-এ কুত্বনীতে হযরত জুহায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত

ان بلالا کان یؤذن للنبی صلّی الله علیه وسلم مثنیٰ مثنیٰ ویقیم مثنیٰ مثنیٰ

'নিশ্চয় বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা'র সম্মুখে আযানের শব্দাবলী দুই দুইবার বলতেন এবং ইক্বামতও দুই দুইবার বলতেন'। *(সুনান-এ দার-এ কুত্বনী ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা)*

এগার. মুসান্নফি আব্দির রযযাক-এ স্বয়ং বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনা রয়েছে,

عبدالرزّاق عن الثوری عن ابی معشر عن ابراهیم عن الاسود عن بلال قال کان اذانه واقامته مرتین مرتین

'হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তার আযান ও ইক্বামত দুই দুই শব্দের ছিল'। *(মুসান্নফি আব্দির রযযাক ২য় খণ্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা; এ রূপ অর্থবোধক বর্ণনা শরহি মা'আনীয়িল আসার ১ম খণ্ড ৯৪ পৃষ্ঠায়ও রয়েছে)*

বার. ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ আপন আপন সনদে বর্ণনা করেন, হযরত আবু মাহযূরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লামা তাকে আযান ও ইক্বামত শিখিয়েছেন।

والاقامة سبع عشرة کلمة الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لااله الا الله، اشهد ان لااله الا الله، اشهدانّ محمد رسول الله، اشهدانّ محمد رسول الله، حی علی الصلوٰة، حی علی الصلوٰة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قدقامت الصلوٰة، قدقامت الصلوٰة، الله اکبر، الله اکبر، لااله الا الله،

'ইক্বামতের সতের শব্দাবলী এ যে, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস্ সালাহ, হাইয়া আলাস্ সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাত, ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাত, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ *(ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনি মাজাহ, ইন্তিকাল ২৭৩ হিজরী, সুনানে ইবনে মাজাহ ৫২ পৃষ্ঠা; সুনানে আবী দাউদ ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)*

উক্ত বর্ণনাসমূহকে একত্রিত করলে দেখা যায় যে, আহনাফের আমল প্রতিটি হাদীসের মর্মানুসারে বিশুদ্ধ ও যথার্থ। ইতার বা বিজোড় তথা এক এক শব্দে ইক্বামতের বিষয়টি তারা উভয় শব্দকে একশ্বাসে আদায় করা অর্থে দ্রুত উচ্চারণের মাধ্যমে আদায় করেন; যা অন্য বর্ণনায় واذا اقمت فاحدر 'এবং যখন ইক্বামত দিবে তখন দ্রুত কর' দ্বারা ব্যাখ্যায়িত। 'ক্বাদ ক্বামাতিস সালাত ব্যতীত' অর্থাৎ তা দুইবার বলতে হবে; এটিও দম নিয়ে বলার মাধ্যমে হানাফীগণ আমল করেন। আর জোড় জোড়, দুই দুইবার বলার এবং সতের শব্দাবলীর বর্ণনাতো তাদের আমলগতই। অতএব ইক্বামতের ক্ষেত্রে আহনাফের অভিমত অগ্রাধিকারযোগ্য।

উপর্যুক্ত বর্ণনালোকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, ইক্বামতের শব্দাবলী এক একবার বলার বিষয়টি ছিল কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিশেষ কারণে; অন্যথায় সার্বক্ষণিক সুন্নাত ছিল জোড় জোড় বা দুই দুইবার বলা, যাতে ইক্বামতের শব্দাবলী সতেরটিই হয়। অবশ্যই এক একবার বলা তথা দশ বা এগার শব্দাবলী বললেও জায়েজ হবে। এক একবার বলার রীতি সার্বক্ষণিকতায় রূপ নেয় উমাইয়া শাসন আমলে। আল্লামা কাসানী লিখেছেন,

وقال ابراهيم النخعى كان الناس يشفعون الاقامة حتى خرج هؤلاء
يعنى بنى امية فافردوا الاقامة ومثله لايكذب واشار الى كون الاقامة
بدعة

'ইব্রাহীম নখ'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মত সত্যবাক ব্যক্তি ইক্বামতকে এক একবার বলার রীতিকে বিদ্'আত ইঙ্গিত করে বলেন, মুসলমানরা সর্বদা ইক্বামতের শব্দাবলী দুই দুইবার বলে আসছে, যাবত না বনু উমাইয়া বের হল এবং ইক্বামতকে এক একবার বলার নূতন রীতি চালু করল'। *(আল্লামা আবু বকর বিন মাসঈদ কাসানী হানাফী, ইন্তিকাল: ৫৮৭ হিজরী, বদায়িউস্ সানায়ি'আ ১ম খণ্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা)*

অতএব প্রমাণিত হলো যে, ইক্বামতের শব্দাবলী সতেরটি হাদীসে না থাকার দাবী হাদীস শাস্ত্রে প্রবক্তার জ্ঞানের দৈন্যতারই পরিচায়ক। এমন গণ্ডমূর্খের বক্তব্য বিবৃতি না শুনার আহ্বান রইল সর্বস্তরের মুসলিম জনতার প্রতি। কেননা ইক্বামতের শব্দাবলী সতেরটি হাদীসে নেই বলে সে আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করেছে। হাদীস শরীফে রয়েছে,

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 'যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ করেছে, সে আপন বাসস্থান জাহান্নামে গড়েছে'। *(বুখারী, মুসলিম ও মুসতাদরিক লিল হাকিম-এ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে সংকলন করেন)* এমন উদ্ভট কথাবার্তা শুনা কিংবা এমন লোকের সংস্পর্শে থাকার মাধ্যমে নিজের আবাস জাহান্নামে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও গুড়িয়ে দেওয়া যায়না। সুতরাং সলফে সালেহীনদের পদাঙ্ক অনুসরণের আহ্বান রইল। আল্লাহ আমাদের সৎপথে দৃঢ়পদ রাখুন।

امين وصلى الله تعالى على رحمة للعالمين
وعلى اله واصحابه اجمعين

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা সমীপে

অনিবার্য কারণ বশত "আত্মার স্বরূপ" ও "কিতাব উল লুম্'আ" (ধারাবাহিক) এ সংখ্যায় ছাপানো গেল না। আগামী সংখ্যা থেকে ইনশাআল্লাহ্ যথারীতি ছাপানো হবে।

সম্পাদক

আল্লাহ ও তাঁর রসুল মুহাম্মদ (দঃ) এর দৃষ্টিতে ঈমান

● এ.এন.এম.এ. মোমিন ●

ভূমিকা :

ঈমান হচ্ছে ধর্মের মূল ভিত্তি। ঈমান বা বিশ্বাস মানব মনের এমন এক অবস্থা যা একটি অবিচলতার ভাব সৃষ্টি করে। যাতে মন ধ্রুব (constant) বা চির স্থির হয়ে অবস্থান করে। তাই সে নিজেকে কোন অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না। এ বিশ্বাস জিনিসটি পৃথিবীর মতই দৃঢ়। এটা একটা নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মহাশক্তি নিহিত।

ঈমান শব্দটি আরবী "আমান: ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আমান এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি ও নির্ভীকতা লাভ। এর থেকে গঠিত হয়েছে আমানত। এটি খেয়ানতের বিপরীত শব্দ। অর্থাৎ যাতে খেয়ানতের ভয় নেই তাই হচ্ছে আমানত। ঈমানের তাৎপর্য হচ্ছে, মনের ভেতর কোন কথা বা মতবাদ গভীর প্রত্যয় ও সত্যতার সাথে এমন ভাবে প্রোথিত বা দৃঢ়মূল করা যার প্রতিকূল কোন কিছু (তত্ত্ব, তথ্য, মতবাদ) প্রবিষ্ট হবার কোন শংকাই থাকবে না। যার মধ্যে এই বিশ্বাসের শক্তি নেই অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতির অভাব আছে সে যা কিছুকে হাতে পায়, তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরতে চায়। সে যেন অথৈ পানিতে পড়েছে। কোথাও পা রাখার জায়গা পায়না। কথায় কথায় কেবলই তার মনে হয় সর্বনাশ হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে দৃঢ় বিশ্বাসীর বা ঈমানদারদের কাজ কর্মে শক্তি আছে কিন্তু উদ্বেগ নেই, ঈমানদার বা বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে এই ধারণা অনুভব করে যে তার একটা দাঁড়াবার স্থান আছে। পৌঁছাবার স্থান আছে। রয়েছে আশ্রয়স্থল। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখতে পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না। একটি অত্যন্ত বড় জায়গায় তার মনের দৃঢ় নির্ভরতা বিরাজমান। এই জায়গাটিকে সে ধ্রুব সত্য বলে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করে এ হচ্ছে সেই বিশ্বাস বা ঈমান যার উপর ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে রয়েছে একটি চিরন্তন ও দৃঢ় উপলব্ধি তা হলো লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু-মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

এক সময়ে শুধুমাত্র এ বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মাত্র কয়েক হাজার ঈমানদারের একটি দল তৎকালীন বিশ্বের সুপার পাওয়ার রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তি ও ক্ষমতাকে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার পরও নিজেদের ক্ষমতা ও দক্ষতার কোনরূপ অবমূল্যতা ও দুর্বলতা অনুভব করতেন না। এবং সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মহত্ত ও শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা সমুন্নত রেখেছেন। বর্তমানে এ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা শত শত কোটি ও তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার গরীব অধঃপতিত জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। তার কারণ হচ্ছে বর্তমান মুসলমান নামধারী জনগোষ্ঠীর একটি জিনিসের অভাব রয়েছে, তাহলো ঈমান।

প্রেমই ঈমানের ভিত্তি

বাইবেলের মতে He that loveth not knoweth not God, for God is love. জন:৪:৮।

অর্থাৎ যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না। কারণ প্রেমই ঈশ্বর। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে পবিত্র প্রেমের উৎস ও মানুষের সাথে আল্লাহর যে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে ইরশাদ করেন: "আমি যখন তার আকৃতি সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তার প্রতি সেজদা করবে।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত ২৯) আল্লাহ মানুষের দেহে তাঁর নিজের রূহ ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে মানবের সাথে ঐশী প্রেমের চিরস্থায়ী সম্পর্ক সঞ্চারিত হয়েছে।

হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার এর মতে প্রেমের সংজ্ঞাটি এরূপ– প্রেম হল নিজ অস্তিত্ব হতে মুক্ত হওয়া এবং চির সত্যের সংগে নিজেকে যুক্ত করা। তিনি আরো বলেন, প্রেমিকের হৃদয়ে যখন প্রেম আগুন ধরিয়ে দেয়, তখন তা তার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রেমাস্পদ ছাড়া আর যত কিছু আছে সব কিছুকে পুড়িয়ে ফেলে।" প্রেমের ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ ও তিতিক্ষা কাজ করতে থাকে।

আল্লাহ বলেন, আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না (সুরা বাকারা ১৫৪ নম্বর আয়াত) অর্থাৎ তারা আল্লাহর প্রেমে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে চিরঞ্জীব হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেমই সকল ধর্মের ভিত্তি।

প্রেমের শক্তি

প্রেম অবিনশ্বর। মৃত্যু প্রেমকে ধ্বংস করতে পারে না। মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা। মৃত্যুকে অতিক্রম করার শক্তি শুধুমাত্র প্রেমের মধ্যেই নিহিত। আমেরিকার সাইকিক রিসার্চার ব্রাড স্টীগার প্রেমকে আখ্যায়িত করেছেন রহস্যময় আকর্ষণীয় শক্তি। The love force বা প্রেমের শক্তি নামে এক গবেষণামূলক বইয়ে তিনি বলেছেন, "মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে দর্শন দিয়েছেন বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। এমন অনেক প্রমাণ সমৃদ্ধ ঘটনা আমি জানতে পেরেছি যা আমাকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করেছে। মৃত্যুর শীতল কাঠি প্রেমের গভীর আকর্ষণীয় শক্তির কাছে পরাজিত এমন বহু প্রমাণ আমি

পেয়েছি।"

মি. ব্র্যাড প্রেমের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন: "প্রেম শুধু অনুভব, চিন্তা বা দৈহিক সুখের অভিজ্ঞতা নয়। তবুও গভীরে অতি গভীরে প্রেম হচ্ছে এক বিস্ময়কর শক্তি।"

এই মহাশক্তি প্রেম কিভাবে মৃত্যুর ওপার থেকে প্রিয়জনকে সাহায্য করে তার অনেক উদাহরণ জনাব স্টিপার তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, উইলিয়াম মন্ডেল ও ইভ পরস্পরকে ভালবাসতেন। তাঁরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বিয়ের এক মাস আগে সড়ক দুর্ঘটনায় উইলিয়াম মারা গেলেন। উইলিয়ামের মৃত্যুতে গভীরভাবে দুঃখিত হলেন ইভ। পরবর্তীতে তাঁর পরিচয় হলো ওয়েল ল্যাভেটির সাথে। ইভকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য ধৈর্যের সাথে দু'বছর অপেক্ষা করলেন। মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হলেন ইভ।

বিয়ের দিন কয়েক আগের ঘটনা। ইভ বিছানায় শুয়ে কাঁদছিলেন উইলির স্মৃতি নিয়ে। কারণ বিয়ের সিদ্ধান্তটি তাঁর মনে অস্বস্তি ভাবের উদ্রেক করছিল। তিনি ভাবলেন উইলি থাকলে তাঁর সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যেত। নিজের কোঁপানো কান্নার শব্দের মধ্যে হঠাৎ ইভ শুনতে পেলেন উইলির ভারী কণ্ঠস্বর। চোখ তুলে তাকিয়ে তিনি দেখলেন সামনে দাঁড়ানো উইলি (মৃত)। জীবিত অবস্থায় যেভাবে দাঁড়াতো ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে ইভকে বললেন উইলি, ওয়েলকে বিয়ে করা ভুল হবে। ওকে যেমন মনে হয় আসলে ও তেমন নয়। ওকে তুমি বিয়ে করবে না।

দু'সপ্তাহ পরে পুলিশ ওয়েলকে গ্রেফতার করলো। অভিযোগ সে মাদকদ্রব্য ব্যবসার সাথে জড়িত। আরও জানা গেল সে বিবাহিত। স্ত্রীকে মাদকে আসক্ত করেছে সে। তার স্ত্রী রয়েছেন পাবলো পার্কে।

দু'বছর পর ইভ পরিচিত হলেন রুম শিন্ডসের সাথে। এক বছর পরে রুম বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ইভের মনে হলো উইলি আবার দেখা দেবেন। রুমকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা জানাবেন। ইভের ধারণা সত্যি হলো। উইলি দেখা দিলেন। ওর ঠোঁটে সম্মতি ও আনন্দের হাসি। কিছু বলার আগেই উইলি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (The love force পুস্তকের বরাতে রহস্য পত্রিকা, আহমেদ নূরে আলম ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২)।

এই পুস্তকে বর্ণিত বহু সত্য ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, জীবিত ব্যক্তিরা শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তিগণকে গভীরভাবে ভালবাসতেন বিধায় মৃত ব্যক্তিগণ এই ভালবাসার দাবীতে তাদের জীবিত প্রিয়জনকে সাহায্য করার জন্য মৃত্যুর পরপার থেকে চলে এসেছেন। আর প্রিয়জন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে কারণে তারা জীবিত প্রিয়জনের নিকট স্বশরীরে আত্মপ্রকাশ করে সঠিক পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে পার্থিব কষ্ট তথা সমস্যা হতে মুক্ত রেখেছেন।

যদি সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে (ঘুমের মধ্যে নয়) শুধুমাত্র পার্থিব প্রেমের অভিজ্ঞতার জন্য মৃত ব্যক্তির নিকট থেকে সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারে তাহলে আল্লাহর নবী রসুল, আহলে বায়াত, আল্লাহর মহান ওলীগণের মত ঐশী মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এই ঐশী প্রেমশক্তিতে কী পরিমাণ ক্ষমতাবান তা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহর ওলীগণ যে মৃত্যুর পরপার থেকে তাঁদের ভক্তবৃন্দকে সাহায্য করতে পারেন বা করতে সক্ষম বা করে আসছেন এটি এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

কালেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্বের তথা সকল প্রকার ইবাদতের মূল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিকতা ও নিয়তের বিশুদ্ধতা। শুধুমাত্র প্রেমের গভীরতায় এই দুটি মহান গুণ অর্জন করা যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তখন তার মধ্যে রহমানের প্রতি প্রেম সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এই ঐশী প্রেমই ঈমানের ভিত্তি। এই ঐশী প্রেমের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: (হে রসুল) আপনি বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে (ভালবাস) অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। কেননা, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সুরা আলে ইমরান-৩১)।

সামাজিক তথা মৌখিক ঈমান ও আন্তরিক ঈমান

পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে: (মরু) আরববাসীরা বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি বল, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং এ কথা বল যে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কারণ এখনও তোমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস (ধর্ম) প্রবেশ করেনি। (সুরা হুজরাত-১৪)।

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সমাজে দুই ধরণের ঈমানদার রয়েছে। অর্থাৎ যারা মৌখিকভাবে কলেমা পাঠকারী ও দৃশ্যত নামাজ, রোজা হজ্ব, যাকাত প্রদানকারী অথচ তারা প্রকৃত ঈমানদার নয় বরং মৌখিক বা সামাজিকভাবে ঈমানদার হিসাবে পরিচিত। ২) প্রকৃত ঈমানদার যাদের অন্তরে ঈমান পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের বাহ্যিক ঈমানদারদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানোর পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে আল্লাহর ওলীদের, তাঁরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য হেদায়েত দানকারী।

এখন কথা হচ্ছে যে, খোদাপুরস্তি কোন ধরণের চরিত্র দাবী করে এবং মানুষের বাস্তবজীবনে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধ্যান-ধারণায় সে নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ কিভাবে হতে পারে, তা এখন এক ব্যাপক আলোচ্য বিষয়-যা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ব্যক্ত

করা সম্ভব নয়। তবে আমি নমুনা হিসাবে হযরত (দঃ) এর কয়েকটা বাণী উদ্ধৃত করছি। এ বাণীগুলো থেকে বুঝা যাবে হযরত (দঃ) যে জীবনব্যবস্থা দিয়ে গেছেন তাতে ঈমান, আমল ও আখলাকের মধ্যে কত সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে।

"সর্বোত্তম ঈমানদারী হলো এই যে, তোমার শত্রুতা ও মিত্রতা হবে আল্লাহর ওয়াস্তে, তোমার মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হতে থাকবে, এবং তুমি নিজের জন্যে যা পছন্দ কর অন্যের জন্যেও তাই পছন্দ করবে। আর নিজের জন্যে যা অপছন্দ কর অন্যের জন্যেও তা অপছন্দ করবে।" অন্যদিকে সামাজিকভাবে পরিচিত বা মৌখিক ঈমানদারদের নামাজ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

নিশ্চয় কপটরা (মুনাফিকরা) আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়, অথচ তিনি (আল্লাহ) তাদের জন্য কৌশল করেন এবং যখন তারা নামাজের জন্য দাঁড়ায় তখন (আন্তরিকতাহীন) আলস্য সহকারে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে তারা অবিশ্বাস ও সন্দেহের মধ্যে .... পড়ে থাকে। না এ দিকে, আর না ওদিকে এবং আল্লাহ যাদের পথভ্রষ্টতায় ঘিরে রাখেন তাদের (পথ প্রদর্শনের) জন্য তুমি কখনই কোন পথ প্রদর্শক পাবে না (সুরা নিসা-১৪২-১৪৪)

এ ধরণের নামাজীর জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে: "সুতরাং এ ধরণের নামাজীর জন্য সাহুন (দোজখ) নির্ধারিত (সুরা মাউন-৪)

ঈমান তত্ত্ব ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগের অপরিহার্যতা

ঈমান তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, চারিত্রিক মূলনীতি ও মানুষের বাস্তব জীবন এ তিনটি প্রকৃতপক্ষে একই সূত্রে গাঁথা। রসুল (দঃ) বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান শুধু একটা দার্শনিক তত্ত্ব মেনে নেয়ার নাম নয় বরং সে ঈমান উৎপত্তিগত দিক দিয়ে স্বভাবতই এক বিশেষ ধরণের চরিত্র দাবী করে। মানুষের মনে যখনই সে বীজ অংকুরিত হয় তখনই আপন স্বভাবের তাগিদে সে একটা বিশেষ ধরণের কর্মজীবনের ধারা সৃষ্টি করে।

খোদার আনুগত্য ও রাসূলের অনুসরণের উপর ভিত্তি করে যে চরিত্র সৃষ্টি হয় তা ব্যাপকভাবে মানুষের সমগ্র জীবনে ও তার প্রতিটি দিক ও বিভাগে প্রয়োগ দৃশ্যমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ কারণেই একজন ব্যবসায়ী যদি খোদাভক্ত হন, তাহলে তার ব্যবসায়ে খোদাভীতিমূলক চরিত্রের প্রকাশ না থাকার কোন কারণ নেই। একজন বিচারক যদি আল্লাহর ভক্ত হন তাহলে আদালতের বিচার কাজে এবং একজন পুলিশ যদি খোদাভক্ত হন তাহলে থানায় তার কাছ থেকে খোদাদ্রোহী বা খোদা বিমুখাচরণ প্রকাশ পাবে এমনটি আশা করা যায় না। অনুরূপভাবে কোন জাতি যদি খোদাভীরু ও খোদাপ্রেমিক হয় তাহলে তাদের নগর জীবনে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুদ্ধ ও সন্ধিতে আল্লাহর আনুগত্যমূলক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটা স্বাভাবিক। তা না হলে সেই জাতির আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকার কোন বাস্তব অর্থই থাকতে পারে না।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বা ঈমান কোন ধরনের চরিত্র দাবী করে এবং মানুষের কর্মজীবনে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধ্যান ধারণায় সেই নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ কিভাবে হতে পারে? বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক জটিল ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে, যা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা অসম্ভব। তবে নমুনা হিসাবে ঈমানের সাথে মানুষের কর্ম জীবনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটি হাদিস পেশ করা হচ্ছে।

রোজা নামাজ ও দান খয়রাতের চেয়েও ভাল কাজ কী জান? সেটা হলো পারস্পরিক বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেয়া। আর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা এমন এক মারাত্মক কাজ যে তার দ্বারা মানুষের সমস্ত নেক কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব তাকে বলে যে কেয়ামতের দিন প্রচুর পরিমাণ নামাজ, রোজা ও যাকাত সাথে নিয়ে এসেছে সেই সাথে কাউকে গালি দিয়ে এসেছে, কাউকে অপবাদ দিয়ে এসেছে, কারো মাল আত্মসাৎ করে এসেছে, কারো রক্তপাত করে এসেছে, কিংবা কাউকে প্রহার করে এসেছে। অতঃপর খোদা তার এক একটি নেকি ঐসব মজলুমদের মধ্যে বন্টন করেন তারপরও তার ঋণ পরিশোধ হলো না বলে তাদের গুনাহ্ তার উপর চাপানো হল এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হল।

যে ব্যবসায়ী দাম বাড়ানোর জন্য জিনিসপত্র আটকিয়ে রাখে সে অভিশপ্ত।

মূল্য বৃদ্ধির আশায় ৪০ দিন খাদ্যদ্রব্য আটকে রাখে যে ব্যক্তি তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই।

খাদ্যদ্রব্য ৪০ দিন আটকে রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয় তবু আটকে রাখার গুনাহ মাফ হবে না।

উপসংহার

আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল(দঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ী দেখা যায় যে, ঈমানের সাথে মানব চরিত্রের সম্পর্ক জীবনের সকল দিক, বিভাগ তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত। ইসলামের ইতিহাস পাঠকারী সবাই জানেন যে, রাসুল(দঃ) এর এ সকল উক্তি শুধুমাত্র তত্ত্বীয় জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং বাস্তব জগতে একটি গোটা দেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি এই ঈমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং মানব জাতির জন্য তথা মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় হিসাবে ঘোষণা করেছেন। বিশ্ব ইতিহাসে এটাই হচ্ছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এ কারণেই তিনি মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।

হযরত যুনাইদ বাগদাদী (রাহ্) এর সূফি দর্শন

মূল ঃ ড. আলী হাসসান আব্দুল কাদের
অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বাগদাদে আধ্যাত্মিক শিক্ষার যারা গোড়া পত্তন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত শাখ্তি (রাহ্) এবং মুহাসিবি (রাহ্)। হযরত শাখ্তি (রাহ্) মূলত ছিলেন পারস্যের অধিবাসী আর মুহাসিবি (রাহ্) ছিলেন আরবের। তাঁরা দুজনেই প্রথাগত ইসলামে এবং সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। হযরত শাখ্তি (রাহ্) আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহিদ) বিষয়ে মনোনিবেশ করেন আর হযরত মুহাসিবি (রাহ্) রক্ষনশীল ইসলামপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ইসলামের আধুনিকায়নের প্রতি জোর দেন যাতে মানুষের নৈতিক বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়।

বাগদাদের আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলোর মূল বিষয় ছিল অবশ্যই তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। তাদেরকে সমসাময়িককালের লোকেরা 'আরবাব আত তাওহীদ' বলে সম্বোধন করতেন (তৌহিদি জনতা), আর তাঁরা তৌহিদের জ্ঞান সন্ধানে বিপজ্জনক উচ্চ মাত্রায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের মতবাদ ও কর্মপ্রণালী গোপনীয়তার সাথে মানুষকে শেখাতেন এবং তাঁদের এ মতবাদ প্রচারের জন্য ব্যতিক্রমী দূর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দ (ইশারাত) ব্যবহার করতেন। সূফিবাদ সম্পর্কিত বিষয় সমূহের প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাঁরা এ পরিভাষার উদ্ভাবন করেছিলেন।

একথা প্রচলিত আছে যে, হযরত যুনাইদ বাগদাদী (রাহ্) সূফিবাদ বিষয়ে সীমিত সংখ্যক লোকের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং তাদের সংখ্যা বিশ জনের অধিক নয়। নি:সন্দেহে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রকৃতি অতিগোপনীয়। তিনি মনে করতেন যদি আধ্যাত্মবাদের মত অতি গোপনীয় শিক্ষা মানুষের কাছে সার্বজনীনভাবে উন্মুক্ত করা হয় তাহলে তা ভুলভাবে গৃহীত হওয়ার সম্ভবনা থাকে এবং তাতে সুফলের চেয়ে কুফলের উৎস সৃষ্টিরও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে লিখিত পত্রে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে অতি সাবধানতা অবলম্বন করেন। তাঁর বন্ধুর কাছে এক পত্রে তিনি লিখেছেন, "আমি তোমার নিকট পত্র লিখা হতে এ কারণে বিরত ছিলাম যে, আমার লিখিত পত্র তোমার অজ্ঞাতে কারো হস্তগত হতে পারে। কিছুদিন আগে ইস্পাহানে আমার এক বন্ধুর কাছে একটি পত্র লিখেছিলাম। পত্রটি কেউ একজন খুলে পড়তে চেষ্টা করেছে কিন্তু চিঠির ভাষা তাঁর নিকট বোধগম্য না হওয়ায় সে তার গূঢ় রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করে। এ কারণে আমি অবশ্য বেশ দুঃখ পেয়েছিলাম। ঐ সমস্ত লোকের প্রতি অতি সতর্ক এবং সদয় হতে হবে যাদের নিকট কোন দুর্বোধ্য বিষয় উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ্ আমাদের শান্তি ও নিরাপদ রাখুন। তোমাকে অবশ্যই কথাবার্তায় সংযত হতে হবে এবং সমকালীন লোকদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখতে হবে। লোকজনের সাথে যখন কথা বল তখন এমনভাবে বল যেন তারা বুঝতে পারে এবং ঐ সমস্ত আলাপ পরিহার কর যেগুলো মানুষের কাছে দুর্বোধ্য।"

'কিতাব উল্-লুম'আ' কিতাবে সমকালীন সূফিদের নিয়ে অনেক গল্পের অবতারনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ইবনে উসমান আল মক্কীর এক ঘটনা উদ্ধৃত করা হল:

একদা হযরত আল মক্কী (রাহ্) এর একান্ত গোপনীয় একটি লিখনী তাঁর এক ছাত্রের হস্তগত হয়। ছাত্রটি লেখাগুলো নিয়ে কোথাও উধাও হয়ে গেল। এ ঘটনা শুনে হযরত মক্কী (রাহ্) বললেন, "আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে এ ছাত্রের হাত, পা ও মাথা কাটা যাবে।" সেই লেখা পাঠকারী ছাত্র 'হযরত আল হুসাইন আল- হাল্লাজ ছিলেন বলে অনেকেই মনে করতেন এবং এ জন্য পরবর্তীতে তাঁকে (মনসুর হাল্লাজ) প্রাণ দিতে হয়েছিল এবং হযরত আল্ মক্কী (রহ্) এর উচ্চারিত ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণতা পেয়েছিল।

অনেক সূফি এমনও বলেছেন যে, সূফিদের গোপন তথ্য সাধারণ জনগণের নিকট প্রকাশ করার কারণেই মনসুর হাল্লাজকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। হযরত আত্তার (রাহ্) বলেন, "একজন বড় সূফি বর্ণনা করেছেন যে, মনসুর হাল্লাজকে যেদিন মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল তার পূর্ব রাত্রিতে তিনি সারারাত এক ভিন্নধর্মী প্রার্থনায় রত ছিলেন। যখন রাত পোহাল ঐ সূফি একটি গায়েবী

আওয়াজ শুনতে পেলেন, " আমরা তাঁর নিকট (হাল্লাজ) শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের গোপনীয়তা প্রকাশ করেছি" হযরত শিবলী (রাহ্) এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আত্তার (রাহ্) আরো বলেন, "ঐ রাত্রিতে আমি ইবাদতে মগ্ন ছিলাম। সকাল হলে আমি ঘুমোতে গেলাম এবং ঘুমে দেখতে পেলাম ক্বিয়ামত হয়ে গেছে এবং স্বয়ং আল্লাহর কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনলাম, মনসুর হাল্লাজের এমনটি হওয়ার কারণ এই যে, সে আমাদের গোপন কথা (আধ্যাত্মিক বিষয়) ফাঁস করে দিয়েছে"। উল্লিখিত কাহিনীর আলোকে আমরা দেখতে পাই, বাগদাদে তৎকালীন সূফি ব্যক্তিত্বরা অতি সতর্কতার সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নিকট হতে গোপন রাখতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, সাধারন লোকজন তাদেরকে (সূফিদেরকে) বুঝতে সক্ষম নন।

সূফিরা মনে করেন, ধর্মের পরম সত্যের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নিহিত আছে। এ আধ্যাত্মবাদ বা সূফিবাদ ঐ সমস্ত লোকের কাছে প্রকাশ করা সমীচীন নয় যারা এটা বুঝতে সক্ষম নন। তাঁদের মতে, অযোগ্য লোকের কাছে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করা এক প্রকার নব্যতান্ত্রিক ধর্মীয় বিশ্বাসের অবতারনা করার সামিল। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, সূফিরা আধ্যাত্মিক দুর্বোধ্য জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে খুবই সজাগ ছিলেন। হযরত যুনাইদ (রাহ্) এর সময়সাময়িক কালের সূফি চিন্তাবিদগণের ধ্যান-ধ্যারণা ও তাঁদের চিন্তা চেতনার বৈশিষ্ট্য ছিল অতি উচ্চমানের। হযরত যুনাইদ (রাহ্) নিজেই এরূপ ছিলেন এবং তাঁর গন্ডিভূক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁরাও এ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমস্যাটুকু যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। হযরত যুনাইদ (রাহ্) সূফিবাদ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে খুব কমই আলোচনা করতেন। তিনি বলেন "আমরা যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তা কুড়ি বছর ধরে আচ্ছাদিত রয়েছে। আজ আমরা কেবল সেই জ্ঞানের কিনারায় এসে দাড়িয়েছি মাত্র।" তিনি আরও বলেন, "জ্ঞানের যে শাখাগুলো আমার বোধগম্য নয় তা নিয়ে আমি বছরের পর বছর মানুষের সাথে আলোচনা করছি। এমন কিছু দুর্বোধ্য বিষয় ছিল যেগুলো আমি না বুঝলেও কিংবা আমার পছন্দমত না হলেও আমি সেগুলোর বিরোধীতা করিনি। আমি সে দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে জানার জন্য গভীর আগ্রহী ছিলাম।" তিনি পুনরায় বলেন, " আগেকার দিনগুলোতে আমরা একে অপরের সাথে মিলিত হতাম এবং জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। কিন্তু বর্তমানে কেউ আর এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ দেখায় না কিংবা আমার কাছে কেউ কিছু জানতেও চায় না।"

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, তখনকার দিনে অর্থাৎ হযরত যুনাইদ (রাহ্) এর জীবনের প্রথম দিকে সূফিবাদের বেশ প্রসার ঘটেছিল এবং এ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ ও একাগ্রতা ছিল খুবই আন্তরিক।

আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের সতর্কতা: হযরত যুনাইদ (রাহ্) এর জীবনের শেষের দিকে বাগদাদের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়। সূফিদেরকে নাস্তিক, কাফির, পুনর্জন্মবাদী ইত্যাদি রূপে দোষারোপ করা হয়। সূফি সংগঠনগুলোর প্রতিটি সদস্যকে এমনকী হযরত যুনাইদ (রাহ্)কেও নব্যতান্ত্রিক তথা বিদয়াতী বলে প্রকাশ্যে দোষারোপ করা হল। হযরত সাররাজ বলেন, হযরত যুনাইদ (রাহ্) বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন বলে তিনি সকলের কাছে একজন বড় বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। তারপরও অনেকে তাঁকে কাফির কিংবা নাস্তিকের দৃষ্টিতে দেখতেন।

অনেক ঐতিহাসিক বাগদাদের সূফি প্রতিষ্ঠানগুলোর এ অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। বাগদাদের খলিফা-আল-মুয়াখ্খাফ এর আদালতে গুলাম আল খলীফ সূফিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। হযরত যুনাইদ (রাহ্) নিজেকে একজন সাধারণ আইনজীবী বলে আদালত থেকে বেরিয়ে আসলেন। অন্যান্যদের আদালতে হাজির করা হল এবং তাদের বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করা হল যে, তারা **আল্লাহর ভালবাসা** সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। গুলাম আল খলীফ এর অভিযোগ ছিল মানব এবং আল্লাহর মধ্যে ভালবাসা সূচক কোন বাক্য উচ্চারণ মানে ইসলামে নব্যতন্ত্রের উদ্ভব ঘটানো। তবে হযরত যুনাইদ (রাহ্) হযরত নুরী (রাহ্), হযরত আবু সাঈদ (রাহ্), এবং অন্যান্য সমসাময়িক সূফিদের মতে স্রষ্টা এবং মানবের মাঝে ভালবাসার (মুহাব্বত) যোগসূত্র রয়েছে। ইমাম কুশাইরী (রাহ্) ভালবাসার (মুহব্বত) অর্থ করতে গিয়ে বলেন; " মুহব্বত (ভালবাসা) এমন এক বিষয় যেটাকে হৃদয়ে অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশের ক্ষেত্রে অতি জটিল বিষয়। এটি কোন সুক্ষাতিসুক্ষ অনুভূতি মাত্র। আধ্যাত্মিক এ সূক্ষাতিসূক্ষ অনুভূতি একজন খোদা

প্রেমিকের সাথে আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের পরিচিতি লাভে সহায়তা করে। ইহা আল্লাহ প্রেমিকের কাছে আল্লাহকে পাওয়ার আশার সঞ্চার করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর (আল্লাহ্‌র) অনুপস্থিতি সে মেনে নিতে পারে না। প্রেমিক বান্দা আল্লাহ্‌র ধ্যানে এমনভাবে বিভোর হয়ে যায় যেন তার অন্তরে এক অনন্য অনুভূতি জাগ্রত হয়। প্রেমিক বান্দা আল্লাহ্‌র ধ্যানে সদা মগ্ন থাকতে চায়; সে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিচ্যুতি মেনে নেয় না। এখানে আল্লাহ্‌র জন্য বান্দার ভালবাসা বা মুহব্বত অসীম এক পবিত্র অনুভূতি যেটা বান্দার পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে অর্জন অসম্ভব।

আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে যে ভালবাসা তাতে দৈহিক কোন আকর্ষণের ব্যাপার নেই। এটা কেবল মানবের সাথে মহান প্রভুর সান্নিধ্য অর্জন মাত্র। "আমি আল্লাহকে ভালবাসি এবং আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন" এ ধরণের শিক্ষা গতানুগতিক অনেক শিক্ষিত মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। হযরত সাররাজ আরো উল্লেখ করেন যে, সূফিদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল তা হল, কুসংস্কার ও সর্বেশ্বরবাদের প্রচার-প্রসার সম্পর্কিত। হযরত নূরী, আবু হাম্‌যা, রাক্কাম, শাহ্‌হাম এবং সামনুন (রাহ্) প্রমুখ সূফিদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দয়ের করা হল। হযরত সাররাজ বলেন," হযরত সামনুন ছিলেন হযরত যুনাইদ (রাহ্) এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু যাকে " আশিক্ব"(প্রেমিক) বলা হত। তিনি সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কথাবার্তায় অতি রসিক ছিলেন। একথা প্রচলিত আছে যে, হযরত সামনুন এর এক নারী শিষ্য তার প্রেমে পড়েন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর নারী শিষ্য তাঁর প্রেমে পড়েছে তিনি সে নারী শিষ্যকে বের করে দিলেন। সেই নারী শিষ্য হযরত যুনাইদ (রাহ্) এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ লোক সম্পর্কে আপনার মত কী যিনি আমাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, কিন্তু পরবর্তিতে সেই আল্লাহ্ অদৃশ্য হয়ে মানুষটি অবশিষ্ট থাকল?" মহিলাটি কী বলতে চায় তা হযরত যুনাইদ (রাহ্) বুঝতে পারলেন কিন্তু তিনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত রইলেন। মহিলাটির ইচ্ছা ছিল হযরত সামনুনকে শাদী করা। কিন্তু সামনুন মহিলাটিকে বিতাড়িত করায় মহিলাটি গুলাম আল খলিফ এর কাছে গিয়ে কিছু লোকের নাম উল্লেখ করে এ মর্মে অভিযোগ করলেন যে, "এই লোকগুলো আমার সাথে ভালব্যবহার করেননি।" গুলাম খলিল বিষয়টি আমলে এনে আরও কিছু অভিযোগ একত্র করে খলিফার আদালতে মামলা টুকে দিলেন। তাদের বিরুদ্ধে যে অপরাধকে লক্ষ্য করে মামলা দায়ের করা হল তা ছিল *"ভালবাসা"* এবং *"আবেগ"* সম্পর্কিত যে শব্দগুলো বিভিন্ন ভাবে ভাষান্তর/রূপান্তর করা যায়। বাগদাদে সূফি প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বিধান্বিত ছিল যে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নাকি তাদের আচরণগত কোন ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল তা নিয়ে।

পরবর্তীতে দেখা যায় বাগদাদের প্রধান বিচারপতি (কাজী) তার ক্ষমতাবলে খলিফাকে প্রধান বিচারক মনোনীত করে মামলাটি হস্তগত করেন। খলিফা মুয়াখখাফ সম্ভবত: সূফিদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমান না থাকায় তাদেরকে মামলা হতে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সরকার এবং দেশের স্বার্থে খলিফা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বলে অনেকের ধারনা। তবে এটা সত্য যে, সূফিদের প্রতি করুণা করে বিচারক এ সিদ্ধান্ত নেননি। যদিও কিছু সূফি লেখক তাই ভেবেছিলেন।

যদিও অভিযুক্ত সূফিগণকে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল এবং তাঁদেরকে কোন শারীরিক শাস্তি দেয়া হয়নি তথাপি দু:খজনকভাবে কিছু লোক সূফিদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন যুগিয়েছিলেন। এ কারণেই হয়ত দেখা গেছে যে, পরবর্তীতে বাগদাদের অনেক সূফি সামাজিক জীবন-যাপন থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন এবং খুবই সতর্ক এবং নীরব রইলেন।

উল্লিখিত ঘটনাগুলো হযরত যুনাইদ (রাহ্) এর অন্তরে গভীরভাবে দাগ কাটল এবং তাঁর পরবর্তী জীবনে এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন। সম্ভবত: তখন থেকেই রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় হযরত যুনাইদ (রাহ্) সূফিবাদের অধিক প্রচারের ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ্‌কেই ভিত হিসেবে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করলেন যে, মানবকল্যাণের স্বার্থে সূফি চিন্তাবিদদেরকে লাগামহীনভাবে চলতে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ধর্মীয় বিষয়ে অতি উৎসাহী কিছু ব্যক্তির অসংগত আচরণ/বক্তব্যকে প্রথাগত ইসলামের ভাবধারায় পরিচালিত করতে হবে যাতে তাদের দ্বারা কোন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি না হয়। (ক্রমশ:)

আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়

● অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ●

বেলায়াত, সূফীতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ "ছিয়ারুল আউলিয়া" যা ১৩০২ ইংরেজী সন থেকে ১৩২০ ইংরেজী সন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিরচিত। কিতাবটি রচনার সূত্রপাত করেন–শায়খুশ শুয়ুখিল আলম, সুলতানুল মশায়েখ, মাহবুবে ইলাহী, হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া কুদ্দাসা সিররাহুল আজিজ। পরবর্তীতে তার পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করেন তাঁরই মুরিদ পরিবারের সদস্য বিখ্যাত আধ্যাত্মিক মণীষী হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক মুহাম্মদ উলুব্‌বী আল কিরমানী (রহঃ) যিনি "আমীরে খুরদ" নামে সমধিক পরিচিত। মূল ফার্সী ভাষায় রচিত এ অমূল্য গ্রন্থখানা অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মাহবুবে ইলাহী খাজা নিজাম উদ্দীন (কঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ ও বিবৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া চিশতিয়া পরিবারের অপরাপর মণীষীদের সম্পর্কে তথ্যাদিও সন্নিবেশিত হয়েছে। ৫৫০ পৃষ্ঠা কলেবরের উক্ত গ্রন্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ বাংলা ভাষান্তর ও ভাব সম্প্রসারণ করতঃ আমরা উপর্যুক্ত শিরোনামে পর্বে পর্বে প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছি।

সেমার সওয়াব সম্পর্কে বর্ণনা: হযরত সুলতানুল মশায়েখ (কঃ) ফরমান যে, আল্লাহ তা'আলার স্মরণে যে অঙ্গ সঞ্চালন (নর্তন-কুর্দন) হয়ে থাকে তা মুস্তাহাব পর্যায়ের। কিন্তু যদি তা ফসাদ বা কেলেংকারীর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তা হবে হারাম। সেমা করার সময় সে رقص বা নর্তন ও حركت (আন্দোলিত)অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলে, এসব কিছু যদি প্রকৃত পক্ষে সেমার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে সেমার প্রভাবাধিক্যের কারণে হয়ে থাকে তাহলে তা অপারগতার معذور পর্যায়ে পড়ে এবং তার উপর কোন জবাবদিহিতা বা কোন শাস্তি হবে না।

কিন্তু যদি জেনে শুনে, ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং লোকজনকে দেখানোর নিমিত্তে ঐ ধরণের নৃত্য বা লম্পঝম্প করে থাকে তাহলে তা হবে হারাম বা নিষিদ্ধ। সুলতানুল মশায়েখ আরো বলেন, দরবেশ বা ফকীরগণ যখন সেমার মধ্যে তালি বাজায় তখন তাদের হাতের গুনাহ বা পাপ সমূহ ধ্বংসশীল অর্থাৎ তাঁদের হাতের পাপ বর্জিত হয়ে যায়। আর যখন না'য়ারা বা চিৎকার ধ্বনি করে তখন তাঁদের আভ্যন্তরিন মনোকামনাগুলো বা খাহেশাত বেরিয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন, হযরত রিছালত পানাহ, নবীয়ে আকরাম (দঃ) আমীরুল মুমেনীন হযরত ইমাম হাসান আলাইহিচ্ছালাম এবং হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিচ্ছালাম উভয়কে যখন رقص (রাক্‌স) বা নর্তন করাতেন অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে খেলনা নৃত্য করে তাদের মন ভরাতেন তখন তিনি এ কালাম শরীফ গুলো বলতেন যে,

حرقه حرقة عين تبته حرقة شى صغير অর্থাৎ তাঁকে চক্ষুর আগুনে জ্বালিয়েছে, তাঁকে ছোট বস্তুর জ্বালা যন্ত্রনায় কষ্ট দিয়েছে।

সেমাকালীন নৃত্য করার রহস্য: তিনি আরো বলেন যে, কেউ কেউ বলে থাকেন যে, অজ্ঞাতসারে কাউয়ালদের বাদ্যের উপর তাল মারার উপর কীভাবে رقص (রক্‌স) নৃত্য হতে পারে? তার উত্তর হলো যখন মানুষের জৈবিক ধারণা ও রিপু জনিত কামভাব ইত্যাদি বিদূরিত হয়ে যায় তখন এটাই তার নৈকট্য প্রাপ্তির নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়।

তিনি পুনরায় বলেন, الست بربكم (আলাছতু বিরাব্বিকুম) আমি কী তোমাদের প্রভু নই আত্মিক জগতে আল্লাহর এ প্রশ্নের উত্তরে قالو بلى (কালু বালা) হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু, বলার সময় কেউ মুখে বলেছিল, কেউ হাতের ইশারায় বলেছিল, কেউ মস্তকের ইশারায় বলেছিল। এরই ফলে পৃথিবীতে সেমা করার সময় অনুরূপ হরকত বা গাত্র প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত হতে থাকে, ঐ অবস্থা এখানে দৃশ্যতঃ প্রকাশ পায়।

হযরত মাওলানা ফখর উদ্দীন জরাবী (রহ্) আপন রিছালা (পুস্তক) এর মধ্যে লিখেছেন যে, কোন কোন লোক যারা সুমধুর কণ্ঠধ্বনি, সুর সংগীতের মধ্যে দেহ আন্দোলিত করে সেটার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এটা হলো ইশকে আকলী বা মেধাগত প্রেম। সুতরাং এধরণের প্রেমের মধ্যে মাশুক বা প্রেমাস্পদের কথা কিংবা তার সম্পর্কে কোন আলোচনা বা তার কোন ঘটনা বর্ণনা দানের প্রয়োজন পড়েনা বরং প্রেমাস্পদের একটুখানি মুচকি হাসি, তাকে এক নজর দেখা এবং তার হাত ও চোখের ইশারা করাটাই যথেষ্ট। এমতাবস্থাকে نواطق روحانى বা অন্তরাত্মার বাকশক্তি বলা হয়। এ বিষয়টি হযরত আমীর খসরু (রহ্) একটি ফার্সী ছন্দে এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

آں چشم سخن گونگه وآں لب خاموش
وآں تلخئے گفتار وشکر خنده چویوسف

হযরত সুলতানুল মশায়েখ খাজা নিজাম উদ্দীন মাহবুবে ইলাহী আরো ইরশাদ করেন যে, বদাইয়ূন শহরে এক ব্যক্তি ওয়াজ নসিহতকারী মাওলানা ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সেমা ও নর্তন কুর্দন সম্পর্কে আপনার মতামত কী? উত্তরে তিনি বলেলন, আমি বেশী কিছু জানিনা তবে এতটুকু জানি যে, যে ব্যক্তি সেমার মধ্যে বে খোদ বা আত্মহারা হয়ে যায় সে গরম তাবার উপর নাচতে পারবে। অর্থাৎ সে সেমার মধ্যে এমনভাবে জ্ঞান হারা হয়ে যায় তার পদতলে গরম কড়াই দিলে সে তার উপরও নর্তন করবে, তার কোন খবর হবে না। উদাহরণ স্বরূপ Chloroform দিয়ে যেভাবে মানুষকে বেহুঁশ করে তার Surgery করা হয় তাতে তার কোন অনুভূতি হয়না তেমনি সেমা চলাকালীন সময়েও তার অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সেমা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনা: তিনি আরো বলেছেন যে মাওলানা বদর উদ্দীন ইসহাক বলেন, এক সময়ের ঘটনা, হযরত শাইখ শুয়খুল আলম ফরিদুল হক ওয়াদ্দীন বাবা ফরিদুদ্দীন (কঃ) সেমা সহকারে নাচতে নাচতে আমার (বর্ণক) কাঁধের উপর তাঁর হাত মুবারক রাখলেন। ঐ ঘটনা আমার জীবনে সীমাহীন গর্বের বিষয়। ঐ সেমা অনুষ্ঠানে সেমা উত্তপ্ত হওয়ার পূর্বে বাবা ফরিদ (কঃ) এর মুরীদ মাহমুদ টপুয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, ওহে মাহমুদ! তুমি জীবিত না মৃত? এ বাণীটি শুনা মাত্র মাহমুদ টপুয়া নাচতে আরম্ভ করলেন। এখানে বুঝা গেল আহলে কলব বা অন্তরাত্মা সম্পন্ন মনীষীদের মুখ নিঃসৃত বাণীর মধ্যেও তাসির বা প্রভাব বিদ্যমান থাকে। কথার মাধ্যমে ফয়েজের বন্যা বইয়ে দিতে পারেন আহলুল্লাহ আওলিয়া এ কেরাম।

গ্রন্থকার বলেন আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা থেকে শুনেছি যে, মাহমুদ (রহ) এর উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে বাকী জীবনে যখন কখনো কোন মজলিসে সেমা অনুষ্ঠিত হতো সেখানে খাজা মাহমুদ টপুয়া সকলের আগে গিয়ে উপস্থিত হতেন।

মসজিদে সেমা করার ঐতিহাসিক ঘটনা: বাবা নিজাম (কঃ) বর্ণনা করেন, অযোদ্ধা শহরের এক কাযী (বিচারক) শেখ শুয়খুল আলম বাবা ফরিদের মতাদর্শের বিরোধী ও বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনি কর্মক্ষেত্র স্থানান্তর হয়ে মুলতান শহরে গমন করেছিলেন, সেখানকার বুজুর্গানে দ্বীনদের সাথে

আলাপে তিনি মাছয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি মসজিদের অভ্যন্তরে সেমা মাহফিল কায়েম করে অর্থাৎ ধর্মীয় মরমী সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করে আর সেখানে বুজুর্গ ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করলেন, কাযী সাহেব এসব কথা আপনি কোন ব্যক্তির সম্পর্কে বলছেন তিনি উত্তর করলেন যে, এসবের ঘটনাকারী হলেন স্বয়ং শেখ শুয়খুল আলম বাবা ফরিদ উদ্দীন (কঃ)। এ কথা শুনে ঐ বুজুর্গ ব্যক্তিগণ ফয়সালা দিলেন যে, আমরা বাবা ফরিদ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে পারিনা। তাকে কিছু বলার ক্ষমতা আমাদের নেই।

বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ বাইরম নামক এক জন কাওয়াল ছিলেন। তাঁর দ্বারা শেখ আওহদীন কিরমানী (কঃ) সেমার কর্ম সম্পাদন করতেন। অর্থাৎ তাঁকে সেমা অনুষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত করতেন। শেখ শুয়খুল আলম (কঃ) ইরশাদ করলেন যে, মজলিসে সেমা কায়েম করো, যখন মজলিস আরম্ভ হলো তখন শেখ বদর উদ্দীন গজনবী এবং শেখ জামাল উদ্দীন হানছবী নৃত্য করতে লাগলেন। ঐ সময় কাওয়াল খাজা নেজামীর এই কসিদাটি গাইতে ছিলেন,

ملامت کردن اندر عاشقی لاست - ملامت کے کند آنکس که بیناست
نه هرتردامنے را عشق زیبد - نشان عاشقان از دور پیداست
نظامی تانی پارسا باش - که نور پارسائی شمع دلهاست

হযরত সুলতানুল মশায়েখ ফরমান যে, শেখ বদর উদ্দীন খুবই বৃদ্ধ ছিলেন, সুতরাং মুসাফির (রহ) তার সম্পর্কে বলতেন যে, তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন, মরমী সংগীত সহকারে নাচ কীভাবে করতে পারবেন। শেখ সাহেব বলতেন যে, নাচ তো তিনি করেন না বরং ..... (ইশক) বা প্রেমই তো নাচ করেন। যাঁর মধ্যে ইশক বা খোদা প্রেম অর্জিত হয়েছে তিনিই তো নাচেন। আরো বলেন, শেখ বদর উদ্দীন গজনবী অতিবৃদ্ধ হওয়ার কারণে হেলে দুলে চলতে পারেন না। এমতাবস্থায়ও তিনি সেমা করার সময় এমনভাবে নর্তন কুর্দন করতেন যে মনে হতো তিনি দশ বছরের শিশু।

এক সময় শেখ বদর উদ্দীন গজনবী আমাকে বললেন যে, এসো আমি তোমাকে সেমা করার অনুমতি পত্র লিখে দেব। আমি বললাম; আমার মধ্যে অতটুকু যোগ্যতা নেই। যে বিষয়ে আমার যোগ্যতা ছিল, সেটা করার জন্য শেখ শুয়খুল আলম বাবা ফরিদ উদ্দীন (কঃ) আমাকে হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। এতদভিন্ন যা কিছু রয়েছে সে গুলো করার আদেশ নেই। তিনি আরো বললেন হয়ত গুগুলো পালন করার মতো যোগ্যতা আমার ছিলনা। হয়তো সেটার মধ্যে আমার ঘাটতি রয়েছে। কথাগুলো আমার অপছন্দ হলো, ঘরে আসলাম তবে দ্বিতীয় দিন বাবা ফরিদ উদ্দীন (কঃ) এর সাক্ষাতে গেলাম। বাবা ফরিদ বললেন, আমার জানা নাই যে, সেমা চলা কালীন আমি সর্বাগ্রে উঠে দাঁড়িয়ে গেছি। তবে শুধুমাত্র এক সময় আমি যখন সেমার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলাম এবং যখন আমার হুঁশ ফিরে আসল তখন আমি আমাকে দণ্ডয়মান অবস্থায় পেলাম। যে ব্যক্তি সেমার মধ্যে প্রথমেই উঠে দাঁড়ায়, ঐ সময় যেসব কাজ কারবার সেমার মধ্যে ঘটে যায় তার সব হিসাব কিতাব, দায় দায়িত্ব তারই ওপর বর্তায়।

সেমা প্রভাবান্বিতকে সম্মান প্রদর্শন: গ্রন্থকার বলেন, আমি

সুলতানুল মশায়েখ কাদ্দাছাল্লাহু ছিররাহুল আজীজ এর হস্ত মুবারকের লিখা পান্ডুলিপি দেখেছি, তথায় লিখা আছে যদি কোন ব্যক্তি সেমা চলাকালে আতিশয্য বশতঃ চিৎ হয়ে পড়ে যায় তাহলে তাকে নিজের পোশাক দিয়ে দেয়া আবশ্যক পড়ে তার ঐ কাপড় কেউ কিনে নেবে। এই ভাবে খরিদ করাটা শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে করা হবে, যদি কেউ নিজকে নিজে আগুনে নিক্ষেপ করে অথবা কোন উঁচুস্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে তাহলে তাকে তুমি কীভাবে আবার ফেলে দিতে চাও। যদি سماع حقيقى (সেমা হাকীকী) বা প্রকৃত সেমা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে ঐ ধরণের বিপদ সংকুল অবস্থাতেও তার কোন ক্ষতি সাধিত হবেনা। যদি শুধুমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সেমা করে থাকে তাহলে ঐ ধরণের লোকের জ্বলে পুড়ে যাওয়া অথবা মরে যাওয়াটাই উত্তম হবে।

সেমা হতে হবে নিস্বার্থ: দারুল আমান বা নিরাপদ শহর দিল্লীতে খাজা কাফুল নামে একজন উঁচু স্তরের দরবেশ ছিলেন। তিনি আমার কাছে দুটি (তৎকালীন) মুদ্রা নিয়ে আসলেন। আমি তা গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন যে, আমার উপর আদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক জুমার দিনে আমি যেন সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন এর রূহ মুবারকের জন্য কিছু প্রেরণ করি। অর্থাৎ সওয়াব রূহানী করি। আর যদি আপনি আদেশ করেন তাহলে প্রত্যেক জুমাবারে আমি গিয়াসপুর অঞ্চলে আপনার অবস্থান স্থলে আপনার নিকট কিছু পাঠিয়ে দিতে থাকব। আমি তার ঐ প্রস্তাবটাও গ্রহণ করলাম।

সুতরাং তিনি প্রত্যেক জুমাতে তার কথামত আমার নিকট দুটি টাকা হাদীয়া প্রেরণ করতে লাগলেন। এক জুমাতে সেমা মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেখানে একটি শে এর বা সংগীত কলি আমার উপর এমন প্রভাব ফেলল যে, তাতে আমি দু হাত উপর দিকে তুলে নিয়ে নর্তন কুর্দন করতে লাগলাম, আমার অন্তরে ধারণা আসল যে, এভাবে কেন নাচতে লাগলাম; প্রত্যেক জুমাতে যখন তোমার জন্য দু' টাকা (তৎকালীন মুদ্রা) ধার্য্য করা আছে তখন ঐ রাকস বা নাচ করাটা তো বিনিময় ভিত্তিক স্বার্থ পূর্ণ হয়ে গেল, একথা ভেবে আমি এসে আমার পূর্বের স্থানে দাঁড়ালাম আর তওবা করে নিলাম; এ কথার উপর তওবা করলাম যে, তার কাছ থেকে যে দু'টাকা করে নিতাম তা আর নেব না। আল্লামা শেখ সাদী সিরাজী (রহ) ফরমান,

رقص وقتے مصلحت باشد کاسیتن کز دوعالم افتانی

একবার হযরত আমির খসরু (কঃ) হাত উঁচু করে নাচতে ছিলেন, হযরত সুলতানুল মশায়েখ (কঃ) আমীর খসরু (কঃ) কে ডেকে নিজের কাছে আনলেন এবং বললেন, তোমার সম্পর্কে এ পৃথিবীর সাথে এসময় তোমার হাত উঁচু করে নাচ করা উচিৎ হবেনা। আমীর খসরু তার হাত নিচে নামিয়ে নিলেন এবং মুষ্টিবদ্ধ করে আবার নাচ শুরু করলেন। গ্রন্থকার বলেছেন, আমি বেশ কয়েকবার আমীরে খসরুকে ঐ অবস্থায় দেখেছি। অর্থাৎ হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তিনি সেমার নাচা নাচতেন।

رقص گرهمے کنی رقص عارفانہ کن- دنیا زیرپائے نہ دست برآخرت فشاں

সেমা কালে নর্তন কুর্দন: সেমাকালীন ঐ সময়েই নর্তন করা বা নাচতে উঠা উত্তম যে, যখন মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং অধৈর্য্য-অসংযত হয়ে কান্নাকাটি ও রোদন করতে থাকে অথবা বসা থেকে পড়ে যায় এবং ইশক বা প্রেম-ভালবাসার আধিক্যতা বশতঃ বিভোর হয়ে যায়। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যদি নাচ (মরমী সংগীত সহকারে নৃত্য) না করে অথবা وجد (ওয়াজদ) গাত্র আন্দোলিত করা না হয় তাহলে ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আবশ্যকীয় ভাবে নৃত্য করতে হবে।

শেখুশ শুয়ুখ শিহাব উদ্দীন সহরওয়ার্দী (কঃ) আপন কিতাবে (আওয়ারেফ এ) লিখেছেন যে, কোন কোন صادق (সাদিক) শ্রেণীর দরবেশ আওয়াজ এবং ওজন বা শব্দ ও সুরের উপর ধ্যান করেই নৃত্য করে থাকেন, কিন্তু প্রকাশ করেন না। তাদের ওয়াজদ ও হাল আধ্যাত্মিক সাধক ফকীরদের অনুরূপ হয়ে থাকে। আর তাদের এ ধরনের নির্বাক নৃত্য এক ধরনের মুনাজাত স্বরূপ। যেমন কোন ব্যক্তি তার অবুঝ শিশুদের সাথে ভাবভঙ্গী ও ইশারা ইঙ্গিতে হাস্য করেন, খেলা খেলেন। সেমার মধ্যে সুরবিহীন নর্তন-কুর্দন করা অর্থাৎ বেতালভাবে নৃত্য করা দোষণীয় বলে বিবেচিত।

আধ্যাত্মিক সেমা পরিচালনার জন্য লোক নিয়োগ: কাযী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (কঃ) সেমা পরিচালনার জন্য একজন লোক নিয়োগ করতেন, তার কর্ম ছিল, যে ব্যক্তি ভিত্তিহীন নৃত্য করবে তাকে মজলিস থেকে বের করে দেয়া। এক সময় এক ব্যক্তি সেমার মধ্যে অসংগত ভাবে বেসুরা-বেতালা নৃত্য করছিল। উক্ত লোকটি তার বক্ষের উপর হাত রেখে তার ভিত্তিহীন নৃত্য বন্ধ করে দিল। এর পর ঐ লোকটি কাযী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (কঃ) এর খেদমতে ফরিয়াদ জানাতে আসলেন, বললেন আমার উপর সেমা বড়ই প্রভাব বিস্তার করেছিল, আকাশের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, আমি বেহেশতের মধ্যে পা রাখতে যাচ্ছিলাম এমন সময় আপনার নিয়োগকৃত ব্যক্তিটি এসে আমাকে ঐ কাজটি থেকে দূরে সরিয়ে দিল, আমাকে বিরত রাখল, আর আমি ঐ নেয়ামত প্রাপ্তি হতে মাহরুম হয়ে গেলাম। উত্তরে কাযী হামিদ উদ্দীন (কঃ) বললেন যে, বেহেশ্‌ত ভিত্তিহীন লোকদের স্থান নয়। এ বর্ণনা থেকে আমরা এ শিক্ষাও পাই যে, প্রতিটি ইবাদত বন্দেগী তার নিয়মনীতি-সঠিক পন্থা, ধর্মসম্মত পদ্ধতি অনুসারে হওয়াই বাঞ্ছনীয় নতুবা তার ফল ভাল হয় না।

মুসলিম নেতৃত্ব-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

মূলঃ টিমেথি জে. জ্ঞানতি, পি.এইচ.ডি.
অনুবাদঃ মোঃ গোলাম রসুল

৫১। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর ওফাতের ঘন্টাখানেকের মধ্যেই হযরত আবু বকর (রাঃ) আতংকগ্রস্ত ও অর্ধ বিশ্বাসী গোত্রের নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, "হে লোক সকল, যারা মুহাম্মদের (দঃ) বন্দেগী কর, তারা জেনে রাখ তিনি আর নেই (ওফাত প্রাপ্ত); আর তোমরা যারা আল্লাহর বন্দেগী কর, তারা জেনে রাখ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। তারপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পড়ে শোনালেন, যে আয়াত ওহুদের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছিল, যেখানে মহানবীর (দঃ) নশ্বরতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

"মুহাম্মদ (দঃ) একজন সংবাদ বাহক (ওহীপ্রাপ্ত) ছাড়া আর কিছুই নন, তাঁর আগে অনেক ওহীপ্রাপ্ত চলে গেছেন। যদি তিনি (দঃ) মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তবে কি তোমরা পায়ের গোড়ালির উপর ভর করে থাকবে? যে ব্যক্তি গোড়ালির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগনকেই পুরস্কৃত করবেন (৩:১৪৪)।"

অল্প কয়েকদিন পর, হযরত আবু বকর (রাঃ) পুনরায় গোত্রের লোকদের নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি তোমাদের নেতা এবং মহানবীর (দঃ) উত্তরসূরী (সাহাবী)। তোমাদের উপর আমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং আমি তোমাদের চেয়ে ভাল কেউ নই। যদি আমি সঠিক থাকি তবে আমাকে সাহায্য কর, যদি আমি ভুল করি, তবে আমাকে শোধরিয়ে দাও।" সুতরাং মহানবীর (দঃ) অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বদান, পরামর্শদান ও সমাজ ব্যবস্থাপনা শুরু হয়ে গেল। বছর যতই গড়িয়ে যেতে লাগল এবং নতুন সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করল, নেতার রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক বিষয়ক জটিলতা বৃদ্ধি পেল এবং গোত্রের মধ্যে বিভাজন দেখা গেল, এমনকি মুসলিম উম্মার ভাই-বোনদের মাঝে রক্তপাত দেখা গেল। এমতাবস্থায় হযরত আলী (রাঃ) যিনি মহানবী (দঃ) এর চাচাত ভাই ও জামাতা ও সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন, ৪র্থ খলিফা হিসাবে আবির্ভূত হলেন এবং মহানবী (দঃ) এর উত্তরসূরীদের মধ্যে সর্বশেষ সঠিক পরামর্শদাতা হিসাবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে ভগ্ন ও বিভক্ত সমাজ পাওয়ার পরেও তিনি (রাঃ) সাহসিকতার সাথে সমাজে ঐক্য ও সঠিক অবস্থা ফিরিয়ে আনলেন, অর্থাৎ ইসলামিক নেতৃত্বের রূপরেখা তৈরী করলেন। মিসরের নবনিযুক্ত গভর্ণর মালিক আল আশতারকে লিখলেন– "সঠিকভাবে কাজ কারাই তোমার প্রিয় সম্পদ হোক, তোমার আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ কর, যা নিয়মবহির্ভূত তা থেকে তোমার আত্মাকে সংযত কর, পছন্দ অপছন্দ থেকে পরহেজ করাই আত্মার সম্মান। প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি, ভালবাসা ও দয়া দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ রাখবে। তাদের সামনে লোভী জন্তুর মত ব্যবহার করবেনা। কারণ তারা দু' প্রকারের হতে পারে, হয় তারা তোমার ধর্মীয় ভাই, অথবা তোমার মত সৃষ্টজীব। তাদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে। কারণ তুমিও তো মহান আল্লাহর নিকট দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা চাও। যেহেতু তুমি তাদের উপরে, যিনি তোমাকে নিয়োগ দিয়েছেন তিনিও তোমার উপরে এবং তাঁর উপর আল্লাহ আছেন যিনি তোমাকে নিয়োগ করেছেন। তাদের প্রয়োজন মেটানোই আল্লাহ তোমার কাছে চান, তাদের সঙ্গে থাকার সময় তোমাকে পরীক্ষা করা হবে।"

৫২। "তুমি দেখবে যাতে মহান আল্লাহর প্রতি সুবিচার হয়। জনগণের প্রতি সুবিচার হয়, তোমার পরিবারের প্রতি সুবিচার হয় এবং যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ কর, তাদের প্রতিও সুবিচার করা হয়। ন্যায়ের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই তোমার কর্তব্য, সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি যা মহানবীর (দঃ) সুন্নাহ ভিত্তিক এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক দায়িত্ব পালন, যা পূর্ববর্তীদের জন্যও প্রচলিত ছিল। আমরা যেভাবে কার্যপরিচালনা করতাম, যা তুমি দেখেছ, তাকে তুমি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কর এবং আমি তোমাকে যেভাবে দিকনির্দেশনা দিয়েছি তাকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ কর।"

"নবুয়তের সময় নেতৃত্বের যে ওহী নাযিল হতো তার অনুপস্থিতিতে মুসলিমদের জন্য ধর্মীয় নেতৃত্ব কী হবে? এ প্রবন্ধে আমরা মুসলিম নেতৃত্ব কী প্রকারের হবে তাই অনুসন্ধান করছি। এবং ইতিহাসে কিভাবে তা প্রচলিত হয়েছে ও বর্তমানে কিভাবে হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান কিরূপ তাও খুঁজে দেখছি। উল্লেখ্য যে, এই অনুসন্ধান প্রাথমিক ও নির্বাচিত, কারণ বিষয়টি ব্যাপক, যা একটি প্রবন্ধে একজন পন্ডিতের দ্বারা খুঁজে বের করার অনুশীলন মাত্র। পাঠকের স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা শিক্ষা ও

ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাঝে একটা সেতু বন্ধন যদিও পেশাগতভাবে আমার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আছে এবং নেতৃত্বের সামনে মুসলিম সমাজকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তারই জন্য এ গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছি। সুতরাং এ সব প্রশ্নের জবাব দানের জন্য জ্ঞানার্জন করা, অবহিত করা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যাতে মুসলিম নেতা ও শিক্ষক হিসাবে কার্য পরিচালনা করা যায়। পাঠককেও মনে রাখতে হবে যে, একজন মুসলিম নেতা কিভাবে কাজ করবেন, সর্বশেষ গন্তব্যে কিভাবে পৌঁছবেন (যার জন্য ইসলাম বিরাজিত), সেই প্রশ্নের জবাব খোঁজার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং আমি মনে করি এটাই মূল বিষয়।

(১) মুসলিম ঐতিহ্যের সর্বোচ্চ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য নবুয়তি নেতৃত্বের দলিল: ইসলামের ইতিহাসে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে, সেখানে ধর্মীয় নেতৃত্বের শুরুই হলো নবীগণের (দঃ) আগমনের সাথে সাথে, কারণ তাঁদেরকে মানবজাতির নেতা ও শিক্ষক হিসাবে বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ সর্বোচ্চ জ্ঞানের আধার মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁরা ওহী প্রাপ্ত হন এবং "যা তাঁরা পূর্বে জানতেন না তা জানিয়ে দেয়া হয়"।

কুরআন ভিত্তিক পদ্ধতি হলো স্বর্গীয় শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে অজ্ঞতা, অহমিকা, অসভ্যতা, নির্যাতন-নিপীড়ন, ন্যায়-অবিচার, পারিপার্শিক বঞ্চনা থেকে সত্য, আলো, সভ্যতা, মানবিকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও অন্যান্য গুণের দিকে নিয়ে আসা (যাতে একজন ঈমানদার বিশ্বাস করেন)। এগুলো থেকে বেরিয়ে নবুয়তি নেতৃত্ব মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা করে যাতে করে বিশ্বাসীগণ উপলব্ধি করেন প্রকৃত সত্যকে, আভ্যন্তরীন গুণাবলী কী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী কী, যেখানে মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া যায় এবং সেখানে স্বর্গীয় নূরের উপস্থিতি বজায় থাকে। নবুয়তি নেতৃত্ব মহান আল্লাহর নিকট ফিরে যাবার নীতির উপর নির্ভরশীল এবং তা সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে কুরআন নবুয়তি নেতৃত্বকে মানবজাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমৃদ্ধ করে।

৫৩। আলিফ লাম রা এই কিতাব (কুরআন) আমি তোমার নিকট নাযিল করেছি, যাতে তুমি সমাজের মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে চালিত করতে পার, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর (সমস্ত প্রশংসা তাঁরই) নির্দেশিত পথে সমর্পন করতে পার। (১৪:১)।

হে কিতাবধারী লোকসকল, আল্লাহর নিকট থেকে হেদায়েতের আলো এসেছে এবং সত্য কিতাব এসেছে যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে হেদায়ত করেন এবং উহাই সঠিক পথ। (৫:১৫:১৬)

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, তিনি তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর পথ দেখান, যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঈমান আনেনা তারাই মন্দ এবং তাদের অনুসারীদের আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায় এবং তারাই চিরদিন জাহান্নামের অগ্নিতে থাকবে। (২:২৫৭)

নবীগণ (আঃ) ওহী প্রাপ্ত হওয়ার অভিজ্ঞতার কারণে প্রকৃত নেতা হিসাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার ফলাফল সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং জ্ঞান-সমৃদ্ধ। তাঁরা বাস্তব জ্ঞান ও নাযিলকৃত ওহী দ্বারা আইন, প্রথা- (বন্দেগীর আমল) এবং নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করতেন এবং বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। তারা মানবজাতিকে ব্যক্তি পর্যায়ে বা সামষ্টিক পর্যায়ে সঠিক পথ দেখাতেন এবং ধীরে ধীরে সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বোধ সম্পন্ন করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে বেহেশত লাভ করা বা স্বর্গে দিয়ে আল্লাহর সংগে মিলিত হওয়ার জন্যই এই পথ। তাছাড়া সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করা, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, স্বর্গীয় গুণাবলীর অধিকারী হওয়া ও আমল করা এসবই একজন অশুদ্ধ মানুষের পক্ষে ধীরে ধীরে ভাকওয়া অর্জন পূর্বক ভাল মানুষে পরিণত হওয়া সম্ভব।

কোন কোন সময় নবুয়তি নেতা যেমন মুসা (আঃ), দাউদ (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং নবুয়তের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁদের নেতৃত্ব সত্য অনুসন্ধানে ব্যপৃত হয়েছে, তাঁদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে এবং তাঁদের চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এভাবে নবুয়তি নেতৃত্ব সমাজের মানুষের কথা বলেছে, তাদের করনীয় কী বা নিষিদ্ধ কী তাও বলতে হয়েছে এবং সর্বশেষ গন্তব্যে পৌঁছার বিষয়ে আমল ও অনুশীলনের তাগিদ দিয়েছে। "আমি দিগন্ত বিস্তৃত চিহ্ন ও দিকদির্দেশনা তাঁদের (নবীদের) দেখাই। (৪১:৫৩) অবশ্যই কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তুমি বুঝতে পারো এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে পার। (১২:২)

মানব স্মৃতি কিভাবে কাজ করে - পর্যালোচনাঃ

● ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ●

আপনার স্মৃতি সম্পর্কে আপনি যত বেশি জানবেন ততই আপনি কিভাবে এটাকে আরও উন্নত করা যায় তা বুঝতে পারবেন। আপনার স্মৃতি কিভাবে কাজ করে এবং বার্ধক্য কিভাবে মনে রাখার সামর্থ্যকে প্রভাবিত করে তার একটা সাধারণ বিবরণ এখানে দেয়া হল।

শিশুর প্রথম কান্না ..... দাদীর হাতে মিষ্টি মোয়ার স্বাদ ..... মহাসাগরের ঝিরিঝিরি হাওয়ার ঘ্রাণ - এ স্মৃতিগুলিই আপনার জীবনের চলমান অভিজ্ঞতা - আপনাকে নিজস্বভাবোধের ধারনা দেয়। এগুলো আপনাকে পরিচিত জন ও প্রতিবেশের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে সহায়তা করে - অতীতের সাথে বর্তমানের মেলবন্ধন রচনা করে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। সত্যিকার অর্থে, আমাদের সামষ্টিক স্মৃতি নির্ধারণ করে দেয় আমরা কারা।

বেশিরভাগ মানুষ তাদের স্মৃতি সম্পর্কে এমনভাবে বলে যেন এটা কোন দৃশ্যমান বস্তু যেভাবে তারা সুশ্রী চোখ অথবা মাথা ভর্তি চুলের কথা বলে থাকেন। কিন্তু স্মৃতি শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মত দৃশ্যমান কোন বস্তু নয় - একে স্পর্শ করা যায় না। এটা একটা ধারনা যা দ্বারা মনে করার প্রক্রিয়াকেই বুঝায়। অতীতে বিশেষজ্ঞরা স্মৃতিকে একটা ছোট ফাইল কেবিনেট হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পছন্দ করত যেখানে তথ্যসমূহ পৃথক পৃথক মেমরি ফোল্ডারে সংরক্ষিত থাকে। কেউ কেউ মানব স্মৃতিকে একটি নিউরাল সুপার কম্পিউটারের সাথে তুলনা করতেও পছন্দ করতেন। কিন্তু বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মানব স্মৃতি এর চেয়েও জটিল - যার কার্যকারিতা মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশে নয় বরং সমগ্র মস্তিষ্ক জুড়েই তার ব্যাপ্তি।

আপনার কি মনে আছে আজ সকালে কী দিয়ে নাস্তা করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি আপনার মনে একটি প্লেট ভর্তি ডিম ভাজা আর বেকনের ছবি ভেসে উঠে, মনে রাখবেন এটা আপনি কোন মনগড়া স্নায়বিক উৎস থেকে খুঁজে আনেননিঃ বরং এ স্মৃতি একটি অসম্ভব জটিল গঠনমূলক প্রক্রিয়ার প্রকাশ - যা আমাদের সবার মধ্যেই আছে - যা মস্তিষ্কের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতি গুলোকে একিভূত করে। প্রকৃতপক্ষে আপনার "মেমরি" একটি সামষ্টিক ব্যবস্থা যার প্রতিটি অংশ স্মৃতি তৈরী করতে, সংরক্ষণ করতে এবং মনে করতে পৃথক ভূমিকা পালন করে। যখনই মস্তিষ্ক কোন তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে, এসব ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাগুলো তখন এই তথ্য থেকে একটি সমন্বিত ধারনা দেয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করে যায়।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি স্মৃতি একটি জটিল গঠন প্রক্রিয়া পার হয়ে আসে। আমরা যখন কোন জিনিসের কথা চিন্তা করি, যেমন-কলম, আমাদের মস্তিষ্ক সেই জিনিসের নাম, আকার, কাজ, পাতায় আঁচড় কাটার শব্দ সবকিছুই আমাদের সামনে নিয়ে আসে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সম্মিলিতভাবে কাজ করে একটি পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি তৈরি করে। কিভাবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সম্মিলিতভাবে কাজ করে যায় নিউরোলজিস্টরা তার ধারনা পেতে শুরু করেছেন মাত্র।

যখন আপনি কোন বাইক চালান, কিভাবে বাইক চালাতে হয় এই স্মৃতিটা আসে মস্তিষ্কের একটা অংশ থেকে, কিভাবে গন্তব্যে পৌছুতে হবে সেটা আসে আরেকটি অংশ থেকে, আরেকটি অংশ মনে করিয়ে দেয় নিরাপদে বাইক চালানোর নিয়ম আর যখন একটা চলন্ত গাড়ি আপনার খুব কাছে চলে আসে, আপনি যে বিচলিত হন সেই অনুভূতিটা আসে মস্তিষ্কের আরেকটা অংশ থেকে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের এই আলাদা আলাদা ভূমিকা সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি না কারণ এগুলো অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষজ্ঞদের মতে, কোন কিছু মনে করা ও চিন্তা করার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তবে তার মানে এই নয় যে, বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন আমাদের মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে। এখনো তারা ব্যাপারটি সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করতে পারেনি। কিভাবে মস্তিষ্ক স্মৃতি সংগ্রহ করে, কিভাবে সাজিয়ে নেয়, কোথায় সংরক্ষণ করে - সবই এখনো মস্তিষ্ক গবেষকদের কাছে অমীমাংসিত প্রশ্ন। এখনো অনেক বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে এটুকু বলা যায়, স্মৃতি তৈরির প্রক্রিয়া হলো প্রথমে ধারন করা, এরপর সঞ্চিত রাখা, পরবর্তীতে পুনরুদ্ধার করা।

এখন আমরা দেখি মস্তিষ্ক কিভাবে সংরক্ষন করে পরে তা আবার পুনরুদ্ধার করে।

স্মৃতি সংরক্ষণ

একটি স্মৃতির সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে কোন ঘটনাকে সংরক্ষণ করা। ইন্দ্রিয় যখন কোন একটি ঘটনাকে গ্রহণ করে, মস্তিষ্ক সেটাকে ধারন বা সংরক্ষণ করে রাখে-

এটা একটি জৈবিক ঘটনা। যেমন ধরা যাক সেই মানুষটির কথা- যে আপনার জীবনের প্রথম প্রেম। যখন আপনার তার সাথে দেখা হত আপনি শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতেন- যেমন তার চোখের রং, চুল; আপনি শুনতেন তার প্রাণখোলা হাসি, তার শরীর থেকে আসা কোন সুগন্ধির সুন্দর গন্ধ, কিংবা অনুভব করতেন তার হাতের স্পর্শ। এই প্রতিটি আলাদা আলাদা অনুভূতি আপনার মস্তিষ্কের একটি অংশে পৌঁছায়, যাকে বলা হচ্ছে হিপ্পোক্যাম্পাস, যেখানে এই সবগুলো স্মৃতি একিভূত হয়ে একটি সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র স্মৃতি সৃষ্টি করে- সেই বিশেষ ব্যক্তির সাথে আপনার অভিজ্ঞতা।

বিশেষজ্ঞদের মতে এই হিপ্পোক্যাম্পাস মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশসহ, যাদের বলা হয় ফ্রন্টাল কর্টেক্স, প্রতিটি আলাদা আলাদা ধারনকৃত স্মৃতিকে পরীক্ষা করে ঠিক করে এগুলো স্মরণযোগ্য কিনা। যদি স্মরণযোগ্য হয়, তবে তারা দীর্ঘ মেয়াদী স্মরণের অংশ হয়ে যাবে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিগুলো মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংরক্ষিত থাকে। কিভাবে বিভিন্ন অংশ থেকে আবার একত্রিত হয়ে তারা একটি পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি তৈরী করে তা এখনো অজানা।

যদিও গ্রহণ করার মাধ্যমে স্মৃতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়, এটা ধারন ও সংরক্ষন করা হয় বিদ্যুৎ ও রাসায়নিকের ভাষায়। এভাবেই এরা কাজ করে। প্রতিটি স্নায়ুকোষ আরেকটি স্নায়ুকোষের সাথে এক জায়গায় মিলিত হয়- যাকে বলা হয় "সিন্যাপ্স"। ব্রেনের যাবতীয় কাজ এই সিন্যাপ্সে হয়ে থাকে যা বৈদ্যুতিক স্পন্দনের মাধ্যমে বার্তা হয়ে কোষের শূণ্যস্থানগুলোতে পৌঁছায়।

শূণ্যস্থানে বৈদ্যুতিক অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে একটি স্পন্দন যে রাসায়নিক বার্তাসমূহ প্রেরণ করে তাকে নিউরোট্রান্সমিটার বলে। এই নিউরোট্রান্সমিটারগুলো কোষের মধ্যবর্তী শূণ্যস্থানের মাধ্যমে ব্যাপিত হয়ে পাশের কোষগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করে। প্রতিটি ব্রেন সেল (মস্তিষ্ক কোষ) এভাবে হাজারো লিংক গঠন করে একটা আদর্শ ব্রেনকে প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন সিন্যাপ্স প্রদান করতে পারে। ব্রেন কোষের যে অংশসমূহ এই বৈদ্যুতিক স্পন্দনগুলো সংগ্রহ করে তাদেরকে ডেনড্রাইট বলে, ব্রেন সেলের পালকসদৃশ টিপস যা পার্শ্ববর্তী ব্রেন সেল পর্যন্ত পৌঁছায়।

মস্তিষ্ক কোষের সংযোগস্থল স্থির নয়- প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। মস্তিষ্ক কোষগুলো নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে সংঘটিত করে একসঙ্গে কাজ করে। এদের একেকটি গ্রুপ একেক ধরনের তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে পারদর্শীতা অর্জন করে। যেহেতু মস্তিষ্কের একটি কোষ অন্য কোষকে সংকেত পাঠায় তাদের মধ্যকার সিন্যাপ্স আরও দৃঢ় হয়। যত বেশি সংকেত পাঠানো হয় সিন্যাপ্স তত দৃঢ় হয়। কাজেই প্রতিটি নতুন অভিজ্ঞতার সাথে আমাদের মস্তিষ্ক একটু একটু করে নিজের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে, আপনি আপনার ব্রেনকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন তার উপর ভিত্তি করে ব্রেন নিজেকে সংগঠিত করে নেয়। এই নমনীয়তা, যাকে বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিসিটি বলে, আপনার ব্রেনকে নিজস্ব উপায়ে পূনর্গঠিত হতে সাহায্য করে যদি তা কখনো নষ্ট হয়ে যায়।

আপনি যত শিখবেন, অভিজ্ঞতা নিবেন, আপনার সিন্যাপ্স ততবেশি পরিবর্তিত হয়ে আরো বেশি সিন্যাপ্স সৃষ্টি হবে। আপনার জীবন থেকে নেয়া অভিজ্ঞতার আলোকে মস্তিষ্ক নিজেকে গঠন করে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা, শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণের আলোকে স্মৃতি তৈরী করে।

এই পরিবর্তনগুলো ব্যবহার করা যায় যাতে করে আপনি যখন নতুন কিছু শিখবেন, নতুন কিছুর চর্চা করবেন, আপনার জানার পরিধি বেড়ে যাবে যা আপনার মস্তিষ্কে নতুন স্মৃতি তৈরী করবে। যখন আপনি কোন গানের বারবার চর্চা করবেন, প্রতিবার চর্চার সময় আপনার মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বিশেষ ভঙ্গিতে জ্বলে উঠবে যা ভবিষ্যতে এই গান করাটা সহজ করে দিবে। ফলাফল হচ্ছে- আপনি গান করাটা রপ্ত করে ফেলেছেন। আপনি এটা এখন আগের চেয়ে দ্রুত করতে পারবেন আগের চেয়ে কম ভুল করে। এবং আরো দীর্ঘ সময় চর্চা করলে আপনি এটাতে যথার্থ পারদর্শীতা অর্জন করতে পারবেন। যদি আপনি বেশ কয়েক সপ্তাহ চর্চা বন্ধ করে দেন, এরপর আবার গান করেন, দেখবেন সেটা আগের মত সুচারুভাবে করা যাচ্ছে না। আপনার মস্তিষ্ক এটা ইতিমধ্যেই ভুলে যেতে শুরু করেছে যা একসময় আপনি খুব ভাল জানতেন।

কোন স্মৃতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রথমে বিষয়টিতে মনোনিবেশ করতে হবে। যদি আপনি সবসময় প্রতিটি বিষয়বস্তুতে মনোযোগ না দেন তাহলে আপনার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক কিছুই আপনার জানার বাইরে রয়ে যাবে এবং শুধুমাত্র ক্ষুদ্র কিছু অংশ আপনার সচেতন মনের মধ্যে জমা হবে। যদি আপনি আপনার গোচরীভূত প্রতিটি ছোট ছোট জিনিস মনে রাখতে চান, তবে সকালবেলা ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই আপনার স্মৃতিভান্ডার পূর্ণ হয়ে যাবে। এই ছোট ছোট উদ্দীপনাগুলো মস্তিষ্কে জমা হওয়ার সময় যাচাই বাছাই করা

হয় নাকি মস্তিষ্ক তাদের তাৎপর্য্য যাচাই করার পর করা হয় এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের কোন তথ্য নেই। যা আমরা জানি তা হচ্ছে আপনি কোন তথ্যের উপর কতটুকু মনোযোগ দিয়েছেন তার উপর নির্ভর করে আপনি সেটা পরবর্তীতে কতটুকু স্মরণ করতে পারবেন।

স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতিতে তথ্য কিভাবে সংরক্ষিত থাকে-

স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি

একবার একটি স্মৃতি তৈরী হলে তা অবশ্যই মস্তিস্কে জমা থাকে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে স্মৃতি তিনভাবে জমা হতে পারে- প্রথমত: সেনসরি পর্যায়ে, অতঃপর স্বল্প মেয়াদী পর্যায়ে এবং কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু স্মৃতি দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি হিসেবে জমা হয়। কারণ সব তথ্য আমাদের মস্তিস্কে জমা করে রাখার দরকার নেই। স্মৃতি তৈরী প্রক্রিয়ার যে বিভিন্ন ধাপগুলো আছে তা একটি ছাঁকন যন্ত্রের মত কাজ করে। তা না করে যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করা হতো তবে আমাদের মস্তিষ্ক তথ্যের বন্যায় ভেসে যেত।

স্মৃতি তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয় কোন একটি তথ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে। এই তথ্য গ্রহণ করার সময় তা সেনসরি পর্যায়ে জমা হয়। তবে তা খুবই অল্প সময়ের জন্য যা এক সেকেন্ডের চেয়েও কম। এই সেনসরি পর্যায় থেকেই কোন একটা তথ্য হতে পারে সেটা কোন শব্দ, কোন স্পর্শ, একটু দীর্ঘতর সময় মস্তিস্কে স্থায়ী হয়।

প্রথম ক্লিকার-এর পরই সেনসেশনটা স্বল্প মেয়াদী স্মৃতি হিসেবে জমা হয়। এ ধরনের স্মৃতিগুলো সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন, এটা প্রায় সাত ধরনের তথ্য একসাথে ধরে রাখতে পারে তবে তা কখনোই ২০ বা ৩০ সেকেন্ডের বেশি নয়। আপনি চাইলে স্মৃতি ধরে রাখার এই সময়টা বাড়াতে পারেন। তবে তার জন্য আপনাকে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যেমন- একটি ১০ ডিজিটের সংখ্যা ৮০০৫৮৪০৩৯২ মনে রাখা একটু কঠিন। কিন্তু এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিই, যেমন ৮০০-৫৮৪-০৩৯২ তাহলে এটা মনে রাখা সহজ। একটা টেলিফোন নম্বরকে এভাবে ভাগ করে নিলে পরে সেটা স্মৃতি থেকে নিয়ে ঐ নম্বরে ফোন করা যায়। একইভাবে, নিজের মনে সংখ্যাটি কয়েকবার আওড়ে নিলেও সেটা স্বল্প মেয়াদী স্মৃতি হিসেবে জমা হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যগুলো আছে তা ধীরে ধীরে স্বল্প মেয়াদী থেকে দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতিতে পরিণত হয়। এই তথ্য যতবেশি ব্যবহার করা হবে ততই তা দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি হিসেবে জমা হবে (এ কারণেই কোন পড়া বারবার চর্চার মাধ্যমে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়)। সেনসরি ও স্বল্প মেয়াদী স্মৃতির মত দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি এত সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন নয় বা সহজে নষ্ট হয়ে যায় না বরং অসংখ্য তথ্য অনেক দীর্ঘ সময় ধরে রাখে।

মানুষ সেই সব বিষয় সম্পর্কে খুব সহজেই তথ্য দিতে পারে যে সম্পর্কে তার ইতিমধ্যেই কিছু জানা আছে, কারণ এতে তার নতুন পাওয়া তথ্য ও ইতিমধ্যে জানা তথ্যের সমন্বয়ে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারনাটা আরো গভীর হয়। যে কারণে একটি সাধারণ মাত্রার স্মৃতি ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিও কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অনেক গভীর ভাবে জানতে পারে।

স্মৃতির কথা চিন্তা করলেই বেশির ভাগ মানুষই মনে করে তা হচ্ছে শুধুই দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি- কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে একটি স্মৃতি দীর্ঘ মেয়াদী পর্যায়ে পৌছার আগে অবশ্যই তাকে সেনসরি ও স্বল্প মেয়াদী স্মৃতি পর্যায় পার হয়ে আসতে হয়। কিভাবে একটি তথ্য দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতিতে পরিণত হয় তা পরের সেকশনে আলোচনা করব। কিভাবে স্মৃতি পুনরুদ্ধার হয় এবং যখন স্মৃতি পুনরুদ্ধার হয় না অর্থাৎ যাকে আমরা 'ভুলে যাওয়া' বলে থাকি তখন কি হয় এসব বিষয়ও পরবর্তী আলোচনায় উঠে আসবে।

স্মৃতি পুনরুদ্ধার

কোন তথ্য বা ঘটনা মনে করতে হলে, যা আপনি একসময় অসচেতনভাবে মস্তিষ্কের কোথাও জমা করে রেখেছিলেন, তা পুনরুদ্ধার করে আপনার সচেতন মনে আনতে হবে। বেশির ভাগ মানুষ মনে করে তাদের স্মৃতি শক্তি 'ভালো' অথবা 'খারাপ', প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ মানুষেরই কোন বিশেষ কিছু মনে করার ক্ষমতা বা স্মৃতি শক্তি ভালো হতে পারে যা অন্য কিছুর ক্ষেত্রে অত ভালোভাবে কাজ করে না। যদি কোন কিছু মনে করতে আপনার কোন অসুবিধা হয় - ধরে নিচ্ছি, এ ব্যাপারে কোন শারীরিক অসুস্থতা নেই- তবে এটা আপনার মস্তিষ্কের পুরো স্মৃতি প্রক্রিয়ার সমস্যা নয় বরং মস্তিষ্কের কোন অংশের ব্যর্থতা হতে পারে।

ধরা যাক, আপনার চশমাটা আপনি কোথায় রেখেছেন সেটা আপনি পরবর্তীতে মনে করতে চাচ্ছেন। প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আপনার চশমাটা রাখার জন্য নিশ্চয়ই একটা জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে। সেটা যদি আপনার খাটের পাশের টেবিলটা হয়ে থাকে, তবে তার উপর চশমাটা রাখার সময় আপনি খেয়াল করবেন কোথায় সেটা রাখছেন;

অন্যথায় পরদিন সকালে আপনার মনে পড়বে না চশমাটা কোথায় রেখেছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তথ্যগুলো আপনার মস্তিষ্কে জমা হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে পুনরুদ্ধার হবার জন্য তৈরী হয়ে গেছে। মনে রাখার এই পুরো প্রক্রিয়াটা যদি যথাযথভাবে কাজ করে, তবে ঘুম থেকে উঠে আপনি ঠিকঠাক মনে করতে পারবেন- চশমাটা কোথায় রেখেছেন।

কিন্তু, আপনি চশমাটা কোথায় রেখেছিলেন সেটা যদি ভুলে যান ধরে নিতে হবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কারণগুলোর যে কোন একটা সেখানে আছে-

- আপনি হয়তো ঠিকভাবে খেয়াল করেননি কোথায় আপনি চশমাটা রেখেছেন, কিংবা

- খেয়াল করলেও হয়ত সেটা মস্তিষ্কে ধরে রাখেননি, কিংবা

- আপনি ধরে রাখা তথ্যটি আপনার মস্তিষ্ক থেকে ঠিকভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারছেন না।

কাজেই আপনি যদি কোন কিছু ভুলে যাওয়া বন্ধ করতে চান তবে মনে রাখার এই তিনটা পর্যায়ই যাতে ঠিকভাবে কাজ করে সেটা আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে।

আপনি যদি কোন কিছু ভুলে যান, হতে পারে আপনি সেটা ঠিকভাবে সংরক্ষণ করেননি, কারণ সংরক্ষণের সময় আপনি পূর্ণ মনোযোগ দেননি অথবা হতে পারে সংরক্ষিত স্মৃতি পুণরুদ্ধারে আপনার সমস্যা হচ্ছে। আপনি যদি ভুলে যান চশমাটা কোথায় রেখেছিলেন, হতে পারে আপনি সেটা ভুলেননি বরং আপনি হয়ত ঠিকমতো মস্তিষ্কে পৌছাতে পারেননি। যেমন আপনি বললেন যে, আপনি পাঁচ ডলারের নোট চিনেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আপনি জীবনে অনেকবার এই নোটটা দেখলেও এটা খুব গভীরভাবে খেয়াল করেননি। ফলে এটার অবয়বটা আপনি চিনলেও পরবর্তীতে এটা খুটিনাটি সহ আপনি বর্ণনা করতে নাও পারেন।

কোন তথ্য সংরক্ষণের সময় পরিপূর্ণ মনোযোগ না থাকলেই পরবর্তীতে তা মনে করতে সমস্যা হয়। আপনি যদি বিমানবন্দরের মত একটা জনবহুল জায়গায় বিজনেস রিপোর্টের মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পড়েন আপনার মনে হতে পারে আপনি যা পড়ছেন তা আপনার মনে আছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ওটা ঠিকভাবে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়না। সর্বোপরি, আপনি ভুলে যান কারণ আপনি মস্তিষ্ক থেকে সংরক্ষিত তথ্য পূণরুদ্ধার করতে পারছেন না। অনেক সময় এমন হয় কোন একটা বিশেষ তথ্য আপনি যখন মনে করতে চান তখন মনে পড়ছে না, কিন্তু সেই একই তথ্য পরবর্তীতে কোন একসময় মনে পড়ে যায়। এটা হতে পারে তখনই, যখন আপনার স্মৃতি পূণরুদ্ধার প্রক্রিয়া ও সংরক্ষিত তথ্যের মধ্যে কোন একটা কিছু মিলছে না।

আমাদের বয়স যদি বাড়ে স্মৃতিশক্তি আরো দূর্বল হয়। এবার আমরা জানবো স্মৃতিশক্তির উপর বার্ধক্যের প্রভাব।

স্মৃতিশক্তির উপর বার্ধক্যের প্রভাব

আপনি আপনার কোন ব্যবসায়িক কাজে কোথাও গেলেন যেখানে আপনি আপনার কোন সহকর্মীকে দেখতে পেলেন। যখন আপনি আন্তরিকতার সাথে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ করে খেয়াল করলেন তার নাম আপনার মনে পড়ছে না। বেশির ভাগ মানুষই এই ঘটনাকে আলজেইমার- যা এক ধরনের অসুখ, হিসেবে ব্যাখ্যা দিবে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা হচ্ছে আপনার স্মৃতি সুশৃংখলভাবে সংরক্ষণ তথা স্মৃতি তৈরী প্রক্রিয়ার একটি ভাঙ্গন মাত্র- যে ভাঙ্গনটা মূলতঃ শুরু হয় বয়স যখন বিশের কোটায় পৌছায় তখন থেকে এবং তা বয়স পঞ্চাশের দিকে যেতে যেতে আরো খারাপ হতে থাকে।

আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম কিভাবে আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন জানা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে পূনর্গঠিত করে, কিভাবে মস্তিষ্ক কোষগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় যা নতুন তথ্যের সাথে সাথে নিজেকে পূনর্গঠিত করে। নতুন কিছু শিখা, জানা, অভিজ্ঞতা কোষের সংযোগস্থল বা সিন্যাপ্সকে আরো শক্তিশালী করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই সিন্যাপ্সের কার্যক্ষমতা কমে যায় যার ফলে আপনি আগের মত সহজে কোন কিছু মনে করতে পারেন না।

কেন স্মৃতিশক্তির এই অবনতি, এ সম্পর্কে গবেষকদের অনেক মতবাদ থাকলেও বেশিরভাগের মতামত হচ্ছে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে মস্তিষ্কের সামনের দিকে একটি ছোট অংশে বেশ কিছু কোষের ক্ষয় হয় যার কারণে নিউরোট্রান্সমিটার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়; একে বলে এসিটাইকোলিন। এই এসিটাইকোলিন কোন কিছু শিখা ও পরবর্তীতে মনে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও মস্তিষ্কের এমন কিছু অংশ আছে যা স্মৃতি তৈরীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বার্ধক্যের কারণে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মস্তিষ্কের একটি অংশ যাকে বলা হয় হিপ্পোক্যাম্পাস, জীবনের একেকটি দশক পার হওয়ার সাথে সাথে পাঁচ শতাংশ হারে কোষ হারায় এবং একটি মানুষ আশির কোটায় পৌছাতে পৌছাতে যার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় বিশ শতাংশ। সর্বোপরি বয়সের সাথে সাথে মস্তিষ্ক নিজেও সংকুচিত হয় এবং কর্মক্ষমতা লোপ পায়।

অবশ্য উপরোল্লিখিত কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ

থাকতে পারে যা স্মৃতিশক্তির অবনতিকে ত্বরান্বিত করে। আপনি হয়ত উত্তাধিকার সূত্রেই একটি দূর্বল জিন পেয়েছেন, কোন বিষাক্ত দ্রব্য আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে, হতে পারে আপনি ধূমপায়ী কিংবা অত্যধিক মদ্যপানের অভ্যাস আছে। এর যে কোন একটি কারণই আপনার স্মৃতিশক্তির অবনতি ঘটাতে পারে।

কাজেই আপনি দেখছেন, বয়স বাড়ার সাথে সাথে মস্তিষ্কের কোষগুলোর গাঠনিক কিছু পরিবর্তনের কারণে আপনি আগের মত কোন কিছু সহজে মনে করতে পারছেন না। তবে সুসংবাদ হচ্ছে, তার মানে এই নয় যে স্মৃতিশক্তি বিনাশ এবং তার ফলে ডিমেনসিয়া অপরিহার্য। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পুরো স্মৃতি প্রক্রিয়া মোটামুটি ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত দৃঢ় থাকে। গবেষণায় দেখা যায় এটা খুব সাধারণ ব্যাপার যে কিছু কগ্নিটিভ পরীক্ষায় একটা ৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধ একটি ২০ বছর বয়সের তরুনের মতই কৃতিত্ব দেখাচ্ছে এবং বেশির ভাগ মানুষই ৬০ ও ৭০ বছর বয়সে এসে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে তরুনদের তুলনায় অনেক বেশি উৎকর্ষ সাধন করছে।

গবেষণায় দেখা যায় বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে স্মৃতিশক্তি জনিত এই সমস্যা কমানো যায় এমনকি এই সমস্যা থেকে মুক্তও হওয়া যায়। পরিবারের অসুস্থ রোগীদের সেবা প্রদানকারীদের উপর চালানো এক সমীক্ষায় দেখা যায়, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী একজন অসুস্থ ব্যক্তি তার স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটাতে পারে যখন তার সামনে কোন চ্যালেঞ্জ বা পুরস্কার রাখা হয়। শারীরিক ব্যায়াম ও মানসিক ইচ্ছাও পারে মানসিক কাজগুলো অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি আরো উন্নত করতে।

প্রাণীদের উপর চালানো এক সমীক্ষায় দেখা যায় উদ্দীপনার মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষগুলোর সংকোচন রোধ করা যায়। এমনকি তাদের আকার বৃদ্ধি করা যায়। ইঁদুরের উপর চালানো এক গবেষণায় দেখা যায়, একটা খুব স্বাস্থ্যকর পরিবেশে যথেষ্ট খেলনা ও আনন্দের মধ্যে যেসব ইঁদুর বাস করে তাদের মস্তিষ্ক কোষগুলো অনেক উন্নত। এবং প্রাণীদের যদি অনেক বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যায় তবে তাদের ডেনড্রাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। গবেষণায় আরো দেখা যায়, আমাদের জীবনের শেষের দিকের সময়ে আমরা যদি এমন একটি উদ্দীপনাময় পরিবেশে থাকি তবে আমাদেরও ডেনড্রাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা একটি অস্বাস্থ্যকর বা নিরানন্দ পরিবেশ বাধা প্রাপ্ত হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা স্কুল জীবনে যত তাড়াতাড়ি কোন কিছু শিখতে পারতাম, মনে রাখতে পারতাম বৃদ্ধ বয়সে ওভাবে আমরা তা পারব না - কিন্তু চেষ্টা করলে প্রায় ঐ সময়ের কাছাকাছি ভাবে শিখা যাবে, মনে রাখা যাবে। অনেক ক্ষেত্রেই একটি বৃদ্ধ ব্যক্তির মস্তিষ্ক কম কর্মক্ষম হয় কোন গাঠনিক বা জৈবিক কারণে নয় বরং শুধুমাত্র কম ব্যবহারের কারণে।

সূফি উদ্ধৃতি

■ মনের পবিত্রতা দ্বারা হক্কুল একীন সৃষ্টি হয়, তারপরে সৃষ্টি হয় ইলমুল একীন, তারপর আসে আইনুল একীন।

■ যিনি যাবতীয় দুনিয়দারীর আপদ থেকে মুক্ত এবং যিনি কোন প্রকার দুনিয়াবী দান গ্রহণ করেন না তিনিই প্রকৃত সূফি।

■ সাধক যখন দুনিয়াকে অন্তরে স্থান দান করে তখন তুমি আর তার দিকে দৃষ্টিপাত করোনা। কেননা নিশ্চয়ই সে তরীকতপন্থী নহে।

–হযরত আবু আদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ফজল (রাহ্)

■ এমন এক যুগ ছিল, যখন লোকগণ ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে কাজ করত, তারপর এক যুগ ছিল, যখন মানুষ প্রতিজ্ঞা রক্ষার খাতিরে কাজ করত। এখন আর ত-ও নেই। তার পরবর্তী যুগে বিবেকানুযায়ী কাজ করা হত। তা-ও আর নেই। তার পরবর্তী যুগে লজ্জাবশত কাজ কারবার হত। তাও এখন নেই। বরং এখন মানুষের অবস্থা এমন হয়েছে যে, শুধু ভয় ও দাপটের প্রভাবে কাজ করে থাকে।

–হযরত আবু মুহাম্মদ জারীর (রাহ্)

নবীদের ইতিহাস

ইমাম উদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির আদ-দামেস্কী (৭০০-৭৭৪ হিজরী)
[মূল আরবী থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ : রাশাদ আহমদ আজমী]
॥ ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ৮৫ কিস্তি)

যার জন্য যত ইচ্ছা তিনি ব্যয় করতে পারতেন, যার জন্য যত ইচ্ছা তিনি তা স্থগিত রাখতে পারতেন। এর জন্য তাঁর কাছে কোন হিসাব চাওয়া হবে না। একজন সম্রাট নবীর জন্য এ বিধি ব্যবস্থা বৈধ ছিল। অন্য নবীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ ছাড়া কোন কিছু করার অনুমতি ছিলনা।

আমাদের নবী করিম রাসূলাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। তিনি শেষোক্ত নবীদের দলে থাকতে চেয়েছেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি হযরত জিব্রাইল আলায়হিস সালামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে শেষোক্ত বিকল্পটি বেছে নিতে পরামর্শ দেন। অবশ্য আল্লাহর পিয়ারা এ নবীর উম্মতদের রাজত্ব দান করা হয়েছে। তাদের রাজ্যাধিকার কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহতায়ালা দুনিয়ায় হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামকে যাবতীয় নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ এও বলেছেন তিনি শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্যতম হবেন।

মহান আল্লাহ বলেন: (বঙ্গানুবাদ) **"এবং আমার কাছে রয়েছে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিনাম।"** (৩৮:৪০)

ইনতিকাল: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যুর কথাটি জানাল মাটির পোকা যা সুলায়মানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলায়মান মাটিতে পড়ে গেল তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে ওরা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতনা। (৩৪:১৪)

আসবাগ বলেন, আমি জানতে পেরেছি হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম এর মৃত্যুর পর তাঁর লাঠি খেয়ে ফেলতে মাটির পোকার এক বছর সময় লেগেছিল। পোকায় লাঠি খেয়ে ফেলার পর তিনি মাটিতে পড়ে যান। অন্যান্য লেখকদের বক্তব্যও অনুরূপ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম বিশ বছর রাজত্ব করেন। ইবনে জরীর বলেন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রেহোবোয়াম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি সত্তর বছর রাজ্য শাসন করেন। এরপর ইসরাইল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

তেইশ অধ্যায়

অন্যান্য নবী আলায়হিস সালাম

ইসিয়াহ বিন আমোষ (আঃ)

ইবনে ইসহাক বলেন: হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ইসিয়াহ (আঃ) কে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি সেই নবীদের একজন যাঁরা হযরত ইসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে হিযেকিয়াহ ছিলেন নবী ইসরাইলের রাজা। রাজা হযরত ইসিয়াহ (আঃ) এর উপদেশ মেনে চলতেন। বনী ইসরাইলের তখন টালমাটাল অবস্থা। রাজার এক পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে বেবিলনের সম্রাট সেনাচেরিব ৬০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে জেরুসালেম আক্রমণে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

জনসাধারণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। রাজা বললেন: "ইয়া ইসিয়াহ (আঃ)! সেনাচেরিব ও তার বাহিনী সম্পর্কে আল্লাহ আপনাকে কোন নির্দেশ দিয়েছেন কি? তিনি জানালেন: আল্লাহর তাদের সম্পর্কে এখনো আমাকে কিছু জানাননি।" এরপর আল্লাহর তরফ হতে নির্দেশ আসে। তাতে বলা হয়: রাজা যেন কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কারণ তাঁর মৃত্যু আসন্ন।

রাজাকে এ খবর জানানো হলে তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর সমীপে সিজদায় আনত হন, সালাত আদায় করেন, আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকেন এবং অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন। তিনি ফরিয়াদ করেন: "হে আল্লাহ! মহান রাজাধিরাজ, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু, মহান দয়ালু ও মহাক্ষমাশীল, আপনি এক ও অদ্বিতীয়, আপনাকে নিদ্রা কিংবা তন্দ্রা কিছুই স্পর্শ করতে পারেনা। হে মহান প্রভু! আমি জীবনে যত সৎকর্ম করেছি এবং বনী ইসরাইলের মধ্যে যে সুবিচার কায়েম করেছি তজ্জন্য আমার ওপর রহমত করুন। এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে শুধু আপনার দয়া ও করুণার বদৌলতে। সে সব সম্পর্কে আমার চাইতে আপনিই অধিক জ্ঞাত।"

মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন। তাঁর ওপর অপার করুণা বর্ষণ করেন। হযরত ইসিয়াহ (আঃ) এর কাছে ওহী পাঠিয়ে তিনি হিযেকিয়াহকে এ মর্মে সুসংবাদ দেন যে, তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে এবং তাঁর হায়াতকে ১৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি

করা হয়েছে। আরো বলা হয় আল্লাহ তাঁকে সেনাচেরিব ও তাঁর বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করবেন।

হযরত ইসিয়াহ (আঃ) হিযেকিয়াহকে আরো জানান যে, তাঁর রোগ নিরাময় হবে এবং তাঁর সকল ক্লেশ দূর হয়ে যাবে। এতে তিনি আবারো সিজদায় আনত হন। তিনি কাতর স্বরে প্রার্থনা করেন: " হে আল্লাহ! আপনি যাকে চান তাকে রাজ্য দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন। আপনি এক ও অদ্বিতীয়। যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন। আপনি আদি আপনিই অন্ত, আপনি একাধারে প্রকাশ্য ও গুপ্ত। নিপীড়িত বান্দার প্রার্থনায় আপনিই সাড়া দেন।"

হিযেকিয়াহ সিজদা হতে মাথা তোলার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসিয়াহ (আঃ) এর কাছে ওহী প্রেরণ করেন। তাতে নির্দেশ দেয়া হয় হিযেকিয়াহ যেন তাঁর রোগাক্রান্ত পায়ে ডুমুরের পানি ঢালেন। তিনি তাই করলে সহসা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এরপর আল্লাহর হুকুমে সেনাচেরিবের বাহিনী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শুধু সেনাচেরিব ও তাঁর পাঁচজন সাথী মৃত্যু থেকে রক্ষা পান। তন্মধ্যে একজন ছিলেন নেবুচান্দনেজার। ইসরাইলী রাজা তাঁদের বন্দী করেন। তাঁদের সবাইকে শিকলে বাঁধা হয় এবং ২৭ দিন ধরে সারা শহরে ঘোরানো হয়। তাঁদেরকে দৈনিক মাত্র দু'টি করে রুটি খেতে দেয়া হত। শেষে তাঁদেরকে জেল খানায় প্রেরণ করা হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসিয়াহ (আঃ) কে নির্দেশ দেন তাঁদের মুক্তি দিতে যাতে তাঁরা নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাঁদের ও তাঁদের সেনাবাহিনীর নির্মম পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সতর্ক করতে পারেন। সেনাচেরিব দেশে ফিরে গেলে পুরোহিত ও জ্যোতিষিরা তাঁকে বললেন: "আমরা বনী ইসরাইলের প্রভু ও তাদের নবী সম্পর্কে ইতিঃপূর্বেই সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু আপনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। তারা এমন এক জাতি যাদের প্রভুকে পরাজিত করা যায় না।"

যাহোক। সেনাচেরিব সাত বছরের মাথায় মারা যান।

ইবনে ইসহাক বলেন: হিযেকিয়াহর মৃত্যুর পর বনী ইসরাইলের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিস্থিতির ভয়ানক অবনতি ঘটে। আল্লাহ তা'আলা নবীর কাছে ওহী পাঠিয়ে ইসরাইলীদের সতর্ক করে দেয়ার ও তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। যদি তারা পাপকর্ম থেকে বিরত না থাকে ও অবাধ্যতায় অনড় থাকে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত করে দেবেন। নবীর এ সদুপদেশ তারা গ্রহণ করা দূরে থাক উপরন্তু তারা হযরত ইসিয়াহ (আঃ) কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। তিনি তাদের ষড়যন্ত্র হতে নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পালিয়ে যান। তিনি ছুটে চলার পথে একটা বৃক্ষ নিজের বক্ষ তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেয় এবং এতে তিনি ঢুকে পড়েন। কিন্তু শয়তান তাঁর পিছু নিয়েছিল। নবী (আঃ) বৃক্ষের অভ্যন্তরে ঢোকার সময় শয়তান তাঁর কাপড়ের একটা অংশ বাইরে রেখে দিয়েছিল।

লোকজন কাপড়ের অংশ দেখে বুঝতে পারে এ গাছের ভেতর হযরত ইসিয়াহ (আঃ) রয়েছেন। তারা একটা করাত দিয়ে গাছটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত করুন।

জেরেমিয়া বিন হিযকিয়াহ

জেরেমিয়া ছিলেন লেভি বিন জ্যাকব এর বংশধর। হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর পুত্র হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) কে যখন হত্যা করা হয় তখন তাঁর দেহের রক্তস্রোত দামেস্কের দিকে প্রাবহিত হতে শুরু করে। জেরেমিয়া তখন রক্তের কাছে দাঁড়িয়ে বলেন: "হে রক্ত! তুমি মানুষকে বড়ই পরীক্ষায় ফেলেছ। তাই তোমার প্রবাহ থামাও।" এতে রক্ত প্রবাহ থেমে যায় এবং এক পর্যায়ে তা অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবু বকর বিন আবু আদ দুন্‌ইয়া বিন আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন: জেরেমিয়া বলেছিলেন: "হে মহান প্রভু! আপনার কোন বান্দাকে আপনি সর্বাধিক ভালবাসেন?" আল্লাহ তাঁকে বলেন: যে বান্দা আমাকে অধিক স্মরণ করে। যারা অন্যান্য সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আমাকে সর্বাধিক স্মরণ করে তাদেরকে আমি বেশি ভালবাসি। যারা মৃত্যু ভয়ে ভীত নয় এবং কখনো দীর্ঘজীবী হতে চায়না।

দুনিয়ার শান শওকতকে তারা ঘৃণা করে, এসব তিরোহিত হলে তারা খুশী হয়। তাদের ওপরই আমি আমার ভালবাসা ঢেলে দেই এবং তাদের প্রত্যাশার চেয়েও তাদের অধিক দান করি।

জেরুসালেমের পতন

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলেন: (বঙ্গানুবাদ)

"আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও সে কিতাবকে করেছিলাম বনী ইসরাইলীদের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাইকে কর্ম বিধায়করূপে গ্রহণ করোনা।"

"হে তাদের বংশধর! যাদের আমি নূহের সাথে (কিশতিতে) আরোহণ করিয়েছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।"

"এবং আমি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাইলকে জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকোর-স্ফীত হবে।"

"অতঃপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার বান্দাদের, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী, তারা ঘরে ঘরে ঢুকে সবকিছু ধ্বংস করেছিল। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।" (১৭:২-৭)

"অতঃপর আমি তোমাদেরকে তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে সাহায্য করলাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।"

"তোমরা সৎকর্ম করলে তা নিজদিগের জন্য আর মন্দকর্ম করলেও তাও করবে নিজদিগের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার বান্দাদের প্রেরণ করলাম, তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা পুরোপুরি ধ্বংস করার জন্য।"

"সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন কিন্তু তোমরা যদি তোমাদিগের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব। জাহান্নামকে আমি করেছি কাফিরদের জন্য কারাগার।" (১৭:৫-৮)

ওহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন: ইসরাইলীদের অপকর্ম বেড়ে গেলে তখনকার নবী হযরত জেরেমিয়াহ্‌র (আঃ) কাছে আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠান। তিনি বনী ইসরাইলকে বলেন: "তোমরা খুবই নিষ্ঠুর হৃদয় ও উদ্ধত। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন তা শুধু তোমাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায়পরায়নতার খাতিরে।" মহান আল্লাহ বনী ইসরাইলের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, "তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ আমার অবাধ্য হয়ে তারা কী কল্যাণ হাসিল করবে? তাদেরকে আরও জিজ্ঞেস করো, আমার আনুগত্য করে কেউ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা? পশুরা পর্যন্ত নিজ বাসস্থান চিনতে পারে ও স্ব-স্ব বাসায় ফিরে আসে। আমি যে কারণে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্মানিত করেছিলাম এ সকল লোক তার সবটুকুই বর্জন করেছে। আমাকে বাদ দিয়ে তারা এখন অন্যত্র সম্মান তালাশ করে। তাদের রাব্বিগণ আমার অধিকার অস্বীকার করে। তারা আমাকে ছেড়ে ইবাদত করে অন্যের। তাদের মধ্যে যারা ইবাদতকারী আছে তারা জ্ঞানকে কল্যাণের কাজে লাগায় না। তাদের নেতৃবৃন্দ আমার অবাধ্যতা করে। আমার নবীদেরকেও অমান্য করে। তারা হৃদয়ে প্রতারণা ও মন্দ বিষয় ধারণ করে রাখে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছুই উচ্চারণ করে না। আমার ইজ্জত ও মহিমার কসম আমি তাদের ওপর এমন এক বাহিনীকে প্রেরণ করব যাদের ভাষা বুঝতে তারা আপারগ হবে। তাদেরকে তারা চিনতেও পারবে না। তাদের শতকান্নাকাটি কারো হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করবে না। আমি এমন এক স্বৈরাচারী রাজাকে তাদের ওপর কর্তৃত্ব দেবো যার সেনাবাহিনী হবে বিশাল মেঘমালার মত। তারা আক্রমন করবে তাদের শহর, গুঁড়িয়ে দেবে তাদের বসতবাড়ি। আমি তাদের জন্য আকাশকে করব লোহার মত এবং মাটিকে করব তামার মত। বৃষ্টি তাদের জন্য কোন শস্য উৎপাদন করবে না। যদি কোন ঘাস জন্মে তা হবে আমার দয়া শুধু মাত্র গবাদি পশু ও জীব জানোয়ারের জন্য। শস্য বপনের কালে আমি বৃষ্টি বন্ধ করে রাখব, ফসল কাটার সময় এলে দেব বৃষ্টির অঝোর বর্ষণ। মধ্যবর্তী সময়ে যদি তারা কোন ফসল বোনে তাহলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসে তা বিনষ্ট করে দেবে। যদি কোন ফসল রক্ষা পায় তা থেকে বরকত তুলে নেয়া হবে। যদি তারা আমার কাছে ফরিয়াদ করে তবে তা কবুল করা হবে না। তাদের কান্নাকাটি আমার দয়াকে স্পর্শ করতে পারবে না। তারা যদি আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব।"

বনী ইসরাইল যখন সর্বক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করে চলছিল এবং ধর্মীয়, নৈতিকতা ও সামাজিক অবস্থা হয়ে পড়ল নাজুক তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জেরেমিয়াহ (আঃ) এর কাছে ওহী পাঠালেন: "আমি ইসরাইলীদের ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছি, তাদের অবাধ্যতার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। অতএব তুমি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন কর। আমি তোমার কাছে আমার আদেশ প্রেরণ করব।" জেরেমিয়াহ (আঃ) বললেন: "হে প্রভু! আপনি তাদের বিরুদ্ধে কাকে প্রেরণ করবেন?" আল্লাহ তা'আলা বললেন: "তারা অগ্নি উপাসক। তারা আমার শাস্তির ভয় করেনা। আমার পুরস্কারের আশাও করেনা। যাও তাদেরকে গিয়ে বল তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় পরায়নতা ও ধার্মিকতার কারণে এতদিন তোমাদেরকে দয়া দেখানো হয়েছে এবং অবকাশ দেয়া হয়েছে। এখন যেহেতু তোমরা আল্লাহর সকল নির্দেশ বিস্মৃত হয়েছ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এক স্বৈরাচারী ও নিষ্ঠুর শাসক প্রেরণ করব যারা তোমাদের প্রতি ন্যূনতম কোন দয়া ও করুণা দেখাবে না এবং যারা তেমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।"

হযরত জেরেমিয়াহ (আঃ) আল্লাহর এ ক্রোধের কথা তাদেরকে জানিয়ে দিলে বনী ইসরাইল তাঁর কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাক অধিকন্তু তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিল। তারা বলল: "তুমি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছ। আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট পৃথিবী এবং উপাসনালয় সমূহ ধ্বংস করে দেবেন এটা হতেই পারেনা। তা যদি হয় তাহলে কে তাঁর ইবাদত করবে আর দুনিয়াতে কে তাঁকে মান্য করবে?" তারা তাঁকে ধরে বন্দী করে রাখল।

চট্টগ্রাম ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে মাইজভাণ্ডারী একাডেমী আয়োজিত ৩য় আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনে বক্তারা

আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে ওঠে আধ্যাত্মবাদ চর্চার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে

নগরীর ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে মাইজভাণ্ডারী একাডেমী আয়োজিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনে দেশি-বিদেশি সূফি ভাবাপন্ন গবেষকরা বলেছেন, দেশে দেশে উপনিবেশ শাসনের আগ্রাসনে ইসলামের শাশ্বত শান্তির বাণী ও মুসিলম মনীষীদের উদারনৈতিক আদর্শ থেকে মুসলমানরা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। যা কিছু সত্য-সুন্দর ও কল্যাণকামী তাই ইসলাম। বক্তারা বলেন, সূফিবাদ ইসলামের নির্যাস ও প্রাণ। লোভ লালসা ও আত্মকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে ওঠে আত্মসংশোধন করাই সূফিবাদের বৈশিষ্ট্য। আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে সূফিদের অনুসৃত আধ্যাত্মবাদ চর্চার মাধ্যমে চলমান হানাহানি-অশান্তির বিপরীতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৯ মার্চ শুক্রবার সকাল ১০টায় জাতীয়, মাইজভাণ্ডারী একাডেমী ও মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মনজিলের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মদ্দজিঃআঃ)। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে খুলশিস্থ বিজিএমইএ মিলনায়তনে ইসলামী চিন্তাবিদ-শিক্ষাবিদ সালাহ উদ্দিন কাশেম খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় গোলটেবিল বৈঠক। সমসাময়িককালের বিশ্বে সূফিবাদ, বস্তুবাদ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির অবস্থা শীর্ষক আলোচ্য বিষয়ের ওপর দেশি-বিদেশি আলোচকরা বক্তব্য রাখেন।

বিকেল ৫টা থেকে ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীর সভাপতি ও সূফি সম্মেলন উদ্‌যাপন পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক এ ওয়াই এম জাফর। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র আলহাজ্ব এম মনজুর আলম। মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সূফিবাদের ভূমিকা, মাইজভাণ্ডারী দর্শন বিশ্ব পরিস্থিতি ও বর্তমান সময়ে করণীয় নিয়ে দেশি-বিদেশি আলোচকদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন-মালয়েশিয়া আই এ আই এস বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক কবি ইশরাফ হোসাইন, মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক থট এন্ড সিভিলাইজেশন এর অধ্যাপক দাতো বাহার উদ্দিন আহমদ, ভারতের পাটনা ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যাপক ড. আলামা সৈয়দ শামিম উদ্দিন আহমদ মুনয়েমী, ঢাকা তুর্কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক ফাতিহ সালিক, তুরস্কের বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ এসির ইজিয়ক, মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. ইব্রাহিম মুহাম্মদ জেইন, ড. নূর মোহাম্মদ ওসমানী, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কুমিলা শাহপুর দরবারের সাজ্জাদানশীন মোহাম্মদ পেয়ারা, ইতিহাস গবেষক এ এন এম এ মোমিন। সূফি সম্মেলনে বক্তাদের আলোচনা শেষে হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর ওরশ এবং মাজার পরিচর্যার ওপর ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে মরমী শিল্পীদের পরিবেশনায় মাইজভাণ্ডারী ভক্তিমূলক গান মাহফিলে সেমা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক তুর্কি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-এর পরিচালক ফাতিহ সালিক বলেন, আজকের দিনে সব জাতির সব ধর্মের সব বিশ্বাসের লোকদের একই পতাকার নিচে একই ঘোষণার মাধ্যমে একত্রিত করা খুবই কঠিন। কিন্তু সূফিবাদ তার প্রেমের দরজা উন্মুক্ত করার মাধ্যমে সবাইকে বলতে পারে এসো প্রেমের পথে, এসো মহান প্রভুর পথে, এসো তাঁর সান্নিধ্যে। সুদানের আলোচক প্রফেসর ড. ইব্রাহিম মোহাম্মদ জেইন বলেন, বর্তমান বিশ্বে অশান্তি-হানাহানির নেপথ্যে রয়েছে মানুষের ইসলামী আদর্শ হতে বিচ্যুতি। সূফিবাদ মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে। আল্লাহর একত্ববাদ, রেসালত ও বেলায়তের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রফেসর ড. নূর মোহাম্মদ ওসমানী বলেন, সূফিবাদ ইসলামের প্রাণ। সকল নবীর মিশন ছিল দুনিয়া-আখিরাতে মানুষের মুক্তি অর্জনের পথ প্রদর্শন করা। মানুষের দেহ, আত্মা, চিন্তা ও কর্মের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে ফেরেশতাসুলভ চরিত্র সৃষ্টি করাই ছিল সকল নবী-রাসূল ও সূফিদের লক্ষ্য। প্রফেসর এসির ইজিয়ক বলেন, সূফিবাদ সর্বজনীন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। ধর্মসাম্য ও মানুষে মানুষে মেলবন্ধন গড়ে তোলাই সূফিবাদের মূল দর্শন। সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন, সর্বাঙ্গীন শুদ্ধাচার অনুশীলন পদ্ধতিই সূফিবাদ। মাইজভাণ্ডারী দর্শনে সূফিবাদের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মাইজভাণ্ডারী মহাত্মাদের দর্শন মানুষের সামনে তুলে ধরে সৎ, নীতিবান, ত্যাগী ও পরিশুদ্ধ মানুষ গড়ে তোলাই আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। সকালে 'সমসাময়িককালে বিশ্বে সূফিবাদ, বস্তুবাদ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির অবস্থা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে দেশি-বিদেশি সূফি গবেষকরা বলেন, বস্তুবাদ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারার মধ্যেই ঘুরপাক খায়। যে কোনো উপায়ে সম্পদ অর্জনই বস্তুবাদের লক্ষ্য। রাজনৈতিক অভিলাষ অর্জনই বস্তুবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ ধরণের দর্শন মানব কল্যাণকামী হতে

পারে না। প্রধান অতিথি মেয়র মনজুর আলম বলেন, মানুষে মানুষে শান্তি-সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের দর্শনের নামই সূফিবাদ। আউলিয়ায়ে কেরামের শিক্ষাই হচ্ছে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে সবাই আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা। এ আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলন বিশ্বজুড়ে হানাহানি-অশান্তির বিপরীতে বিশ্ববাসীকে পথ দেখাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনের শেষ দিনে (১০ মার্চ শনিবার) দেশি-বিদেশি সূফি গবেষকরা বলেছেন, সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে শান্তি ও স্বস্তি। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যাদের দ্বারা পরিচালিত তারা নেতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রতাপ ও প্রতিপত্তির প্রয়াসী। দাপট প্রদর্শনের অশুভ প্রতিযোগিতায় তারা মানুষের জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাস, নিপীড়ন ও জুলুম। বক্তারা বলেন, জুলুমবাজ নেতারাই 'সন্ত্রাস' বলে এমন এক মাতম তুলেছে যাতে কে আক্রমণকারী আর কে আক্রান্ত তা বোঝাই যায় না। বিত্তের আরাধনা নয় চিত্তের সাধনাই সূফিদের বৈশিষ্ট্য উলেখ করে তারা বলেন, সূফিরা সম্পদের পূজা করে না। সম্পদকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে। বিত্তের প্রকাশে নয় চিত্তের বিকাশেই মানুষের মর্যাদা শীর্ষমুখী হয়। বস্তুবাদ, রাজনৈতিক আধিপত্য ও বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে সূফিদের সমন্বয়ধর্মী ভালবাসাভিত্তিক দর্শনের চর্চা ও অনুশীলন অপরিহার্য উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, হাত আছে বলেই হাতাহাতি-হানাহানিতে জড়িয়ে পড়তে হবে তা সূফিদের দর্শন নয়। অথচ এখন চলছে বিশ্বজুড়ে হাতিয়ে নেয়ার অর্থনীতি। মানুষ একদিকে অর্থনৈতিক মুক্তি খুঁজছে আর অন্যদিকে গুঁৎ পেতে আছে কিভাবে কার কাছ থেকে সবকিছু হাতিয়ে নেয়া যায়। বিশ্ববাসীকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হলে মানুষের হাতকে করতে হবে বন্টনের হাত ও ত্যাগের হাত; লুণ্ঠনের হাত নয়। মাইজভাণ্ডারী সূফিরা এ পথেই মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর সহ-সভাপতি ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড সোস্যাল সায়েন্সের ডিন প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সূফি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ-ইসলামী চিন্তাবিদ সালাহ উদ্দিন কাশেম খান। কুরআন মজিদ থেকে তেলাওয়াত, নাতে রাসূল (দ.) ও মাইজভাণ্ডারী সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বিকেল ৫টায় সূফি সম্মেলন শুরু হয়। আসন গ্রহণের পর অতিথি ও আলোচকদের মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সম্মেলন শেষে হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর ওরশ এবং মাজার পরিচর্যার ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। সবশেষে মাইজভাণ্ডারী মরমী শিল্পীদের পরিবেশনায় মাইজভাণ্ডারী ভক্তিমূলক গান মাহফিলে সেমা অনুষ্ঠিত হয়। সূফি সম্মেলনে মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম জি আ) সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গবেষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. জামাল নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মঈন উদ্দিন আহমদ খান, মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর সভাপতি প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী, জামাল আহমদ সিকদার, অধ্যাপক এ ওয়াই এম জাফর, মাইজভাণ্ডারী গবেষক ড. সেলিম জাহাঙ্গীর। এতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মালয়েশিয়া আইএ আইএস এর রিচার্স ফেলো ড. এরিক উইংকেল (আলোচ্য বিষয়ঃ মাস্টিপল ল্যাংগুয়েজ ট্রান্সলেশন অব দি ফুতুহাত আল মক্কিয়া), মিশর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ইসলামিক শরিয়াহ এর অধ্যাপক ড. আহমদ মাহমুদ আবদুলাহ কারিমা (কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সূফি), বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. এম শমসের আলী (বিজ্ঞান ও তাসাওউফ) গবেষক মুহাম্মদ ওহীদুল আলম (মাইজভাণ্ডারী দর্শন), ড. জিনবোধি ভিক্ষু, ফাদার যোসেফ জীবন গমেজ। বিদেশী আলোচকদের বক্তব্য বাংলায় ভাষান্তর করে শোনান আলামা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আজহারী। সম্মেলনে ধন্যবাদ বক্তব্য দেন আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলন উদ্‌যাপন পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক লায়ন আলহাজ্ব দিদারুল আলম চৌধুরী। আলোচক প্রফেসর ড. এম শমসের আলী বলেন, পৃথিবীতে আসমানে-জমিনে যা কিছু আছে তার দিকে তাকালেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্ব ও মহিমা উপলব্ধি করা যায়। সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্ময়কর দিকগুলোর ওপর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেন তিনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের মাধ্যমে দিন দিন ইসলামের বিধানসমূহের সত্যতা ও বাস্তবতা উন্মোচিত হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মাইজভাণ্ডারী মহাত্মাগণ মানুষকে সত্য, কল্যাণ ও আলোর পথে ডেকেছেন। মাইজভাণ্ডার শরিফে গেলে চিত্তের প্রশান্তি ঘটে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রফেসর ড. এরিক উইংকেল বলেন, সূফিরাই ইসলামের শুদ্ধতম চর্চার মাধ্যমে শান্তি ও মানবতার পতাকাকে উড্ডীন রেখেছে। 'ফতুহাত আল-মক্কিয়াহ' সহ বহু সূফি চিন্তাধারার গ্রন্থে সূফিবাদ ও সূফিদের দর্শন সঠিকভাবে আলোচিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। গবেষক মুহাম্মদ ওহীদুল আলম বলেন,

সূফিবাদ ইসলামের নির্যাস। মানুষের দেহ ও আত্মার সমন্বয়ই সূফিবাদ। দেহ ও আত্মার চাহিদা সাংঘর্ষিক। আত্মার চাহিদা পূরণ না করে প্রবৃত্তির খেয়ালখুশির অনুসরণ মানুষকে অনেক নিচে নামিয়ে আনে। সূফিবাদ মানুষকে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে উন্নত স্তরে উপনীত করে। ড. আহমদ মাহমুদ কারিমা বলেন, কুরআন-সুন্নাহর মর্মবাণী সূফিবাদের অনুরণন মাত্র। সূফিবাদ নতুন কোনো সংযোজন নয়, ইসলামের মূল সুর এতে বিবৃত। যারা সূফিবাদে বিশ্ববাসী নয় তারা ভুল পথে পরিচালিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। কবি ইশরাফ হোসেন বলেন, ইসলামের তিনটি কেন্দ্র রয়েছে। মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ। মসজিদ ও মাদ্রাসায় মুসলমানদের বিচরণ রয়েছে। আর আউলিয়ায়ে কেরামের খানকাহ সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত। পৃথিবীর সকল মানুষ একই জাতি হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। বিভিন্ন ধর্মে-বর্ণে বিভক্তি মানুষের পরিচয়ের জন্যই। তাই মানুষে মানুষে বিভাজন কাম্য হতে পারে না। প্রফেসর ড. আবু বকর বলেন, সূফিবাদের অনুসরণের মাধ্যমে সহিংস অশান্ত বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে হবে। প্রধান অতিথি সালাহ্ উদ্দিন কাশেম খান বলেন,অশান্তি-সংঘাতে পৃথিবীবাসী শংকিত ও উদ্বিগ্ন। এই অশান্ত-দ্বন্দ্বমুখর আবহ থেকে পরিত্রাণ পেতে এ আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনের আয়োজন। সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, মাইজভাণ্ডারী দর্শন ইসলামের বিশ্বদৃষ্টির উত্তরাধিকার বহনকারী একটি জীবন্ত ও জীবন ঘনিষ্ঠ দর্শন। কুরআনের বাণীর নিরিখে ও প্রিয় নবীর (দঃ) শিক্ষার আলোকে এ দর্শনের ভেতর ও বাইরের রূপ নির্মীতি ও আলোকিত হয়েছে। তাই মাইজভাণ্ডারী দর্শনকে বুঝতে হলে কুরআনকে বুঝতে হবে। ধন্যবাদ বক্তব্যে লায়ন দিদারুল আলম চৌধুরী আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিতাকারী সবার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সূফি সম্মেলন উপলক্ষে 'তাসাউফ' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। সালাত সালাম শেষে বিশ্ব শান্তি, দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনায় মুনাজাত পরিচালনা করেন গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)। হাজারো মানুষ আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

এ উপলক্ষে গত ৪ মার্চ রোববার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলন উদ্‌যাপন পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক এ ওয়াই এম জাফর। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন একাডেমীর সভাপতি প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী ও আলহাজ্ব সূফি মিজানুর রহমান। প্রেস ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, জাগতিক অতি কামনা ও ভোগবাদী জীবনদৃষ্টি প্রবল হয়ে উঠায় মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-দূরত্ব, সংঘাত-হানাহানি ও অশান্তি দিন দিন বাড়ছে। মানুষ যে আশরাফুল মখলুকাত এই বোধ ও চৈতন্য লুপ্ত আজ অনেকের মাঝে। সংঘাত-হানাহানির পথ থেকে দূরে থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগী হওয়া, প্রিয় নবী (দঃ) ও আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য চেতনা জাগ্রত করা এবং কর্তব্যমুখী জীবনধারায় ফিরে আসার মধ্যেই নিহিত শান্তি ও কল্যাণ। সূফি ব্যক্তিত্বদের শুদ্ধচারি জীবনধারায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা গেলে ভোগ-ঐশ্বর্যের দৌড় থেকে সৃষ্ট অশান্তি ও অকল্যাণের ধূম্রজাল কেটে যাবে বলে প্রেস ব্রিফিংয়ে উল্লেখ করা হয়। প্রেস ব্রিফিংয়ে মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, ইসলামী চিন্তাবিদ সূফি মিজানুর রহমান, দিদারুল আলম চৌধুরী, আলহাজ্ব শামসুল আনোয়ার, এস এম সিরাজুদ্দৌলা, আলামা শায়েস্তা খান, মুহাম্মদ শাহনেওয়াজ চৌধুরী, অধ্যাপক তরিকুল আলম, এইচ এম রাশেদ খান, আশরাফুজ্জামান আশরাফ প্রমুখ।

মাইজভাণ্ডারী গাউছিয়া হক কমিটি সূর্যগিরি আশ্রম শাখার উদ্যোগে দুঃস্থদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী ও বস্ত্র বিতরণ

ফটিকছড়ি হাইদচকিয়াস্থ মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি সূর্যগিরি আশ্রম শাখার উদ্যোগে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্মরণে আলোচনা সভা এবং সূর্যগিরি আশ্রমের নিয়মিত মাসিক সভা আশ্রমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ডাঃ বরুন কুমার আচার্য্য (বলাই) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন হাফেজ মাওলানা জনাব মোঃ আবুল কালাম সাহেব, বিশেষ অতিথি বাবু গৌতম সেবক বড়ুয়া, নাজমুল হক, মোঃ ইদ্রিস, বাবু গৌরাঙ্গ দত্ত। সভাশেষে গরীব-দুঃস্থদের সকল শিক্ষা-সামগ্রী এবং বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পরিশেষে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি মানিকপুর শাখার ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালিত

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি মানিকপুর শাখার উদ্যোগে জনাব কোরবান আলীর বাড়ীতে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) ও বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর চান্দ্র বার্ষিকী ফাতেহা উদযাপন উপলক্ষে এক মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জনাব নুরুল ইসলাম ও

জনাব শফিউল আলম মুনিরী সাহেব। উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী প্রতিনিধি জনাব শফিউল আলম, মাসুদ চৌধুরী, জানে আলম, হাসান, আমির হোসেন, আমান উল্লাহ, নজরুল ইসলাম, এরশাদ প্রমুখ। আলোচনা শেষে মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল শেষ করা হয় এবং তাবারুক বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে সেমা মাহফিল করা হয়। সেমা মাহফিল পরিচালনা করেন এলাকার জনপ্রিয় শিল্পী জনাব এম জানে আলম ও এম, ও কাশেম।

বক্তপুর ভাণ্ডারের খাদেম সৈয়দ আহমদুল হকের ইন্তিকাল

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সদস্য ও ফটিকছড়ি বক্তপুর ভাণ্ডারের খাদেম বিশিষ্ট সমাজ সেবক সৈয়দ আহমদুল হক প্রকাশ আহমদ ফকির গত ১৮ জানুয়ারী বুধবার বিকেল ৪ টায় বক্তপুর সৈয়দ বাড়ীস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি স্ত্রী ২ পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য দরবারী পীরভাই গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আজ সকাল ১১ টায় মরহুমের নামাযে জানাযা ফটিকছড়ি বক্তপুর সৈয়দ বাড়ী জামে মসজিদ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম আহমদুল হকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মাইজভাণ্ডার গাউসিয়া হক মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ), বক্তপুর ভাণ্ডার শরীফের শাহযাদা সৈয়দ নুরুল আতাহার আসিফ, সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব রফিকুল আনোয়ার, উত্তর জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব এটিএম পেয়ারুল ইসলাম, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আফতাব উদ্দিন চৌধুরী, সম্প্রযুগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জেলা লায়নস দ্বিতীয় ভাইস গর্ভনর এস. এম শামসুদ্দিন, উপজেলা আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক এম. সোলায়মান বি.কম, বক্তপুর ভাণ্ডারের সভাপতি সৈয়দ জাবের সরওয়ার, আল্লামা ইকবাল ইউসুফ, এস. এম কাইয়ুম, আজাদী বাজার পরিচালনা পর্ষদ সাধারণ সম্পাদক এস. এম আবুল ফয়েজ, সম্প্রযুগ সভাপতি আবদুস ছালাম পিপুল, সাধারণ সম্পাদক এম. এস আকাশ, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ বশির উদ্দিন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা মাসুদ পারভেজ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গভীরভাবে শোক প্রকাশ করে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলাধীন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফস্থ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট পরিচালিত উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার কার্যকরী কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা সম্প্রতি গাউসিয়া হক মনজিলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী। সভায় বিভিন্ন সামগ্রী প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় সহ সভাপতি হাজী মোঃ সাহাবুদ্দিন, অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ, আলহাজ্ব কামরুল হাসান চৌধুরী, খোকন, ফরিদ উদ্দিন মাহমুদ, কাজী মোঃ ইউছুপ, শেখ নুরুল আমিন শাহ, এম মাকসুদুর রহমান হাসনু, এম শওকত হোসাইন, শেখ মুজিবুর রহমান বাবুল ও মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম চৌধুরী।

হক ভাণ্ডারী স্মরণ সভা সংসদ এর ২৪তম বার্ষিক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

বোয়ালখালীর ঐতিহ্যবাহী সংগঠন খিতাপচর হক ভাণ্ডারী স্মরণ সভা সংসদের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ), আলোচনা সভা ও মাইজভাণ্ডারী মহা সমাবেশ গত ১৪ মার্চ বুধবার বেঙ্গুরা স্টেশনস্থ আলহাজ্ব দেলোয়ার হোসেন সওদাগর জামে মসজিদ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমির ভাণ্ডার দরবার শরীফের শাহজাদা সৈয়দ ফরিদুল আবছার শাহ্ আমিরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদের সভাপতি আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী, ৫নং সারোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম. নূর মোহাম্মদ, আলহাজ্ব সৈয়দ নুরুল আতাহার বিল্লাহ (কানুন) সুলতানপুরী, শাহজাদা শাহ্সুফি শেখ আবু মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ফারুকী, বিশিষ্ট মাইজভাণ্ডারী গবেষক মওলানা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আল-আযহারী, শাহজাদা সৈয়দ মাওলানা আবুল ফজল মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ্ সুলতানপুরী, মাওলানা কাজী নিজাম উদ্দিন, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস আলকাদেরী, মাওলানা নূর হোসেন হেলালী। উক্ত অনুষ্ঠানে মাইজভাণ্ডারী সংগীত পরিবেশ করেন আহমদ নূর আমিরী। সব শেষে মুনাজাত ও তাবারুক বিতরণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি আজিমপুর শাখার অনুদান প্রদান ও বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ আজিমপুর শাখার উদ্যোগে কমিটির সদস্য মোঃ নুর নবী'র বোনের বিয়েতে নগদ অনুদান প্রদান করছেন কেন্দ্রীয় কমিটির

সভাপতি আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী। এতে কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ কাশেম, নুরুল আলম, আশরাফ উদ্দিন সিদ্দিকী, দেলোয়ার হোসেন, ইসমাইল ও মোঃ জুলু। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল সদস্যদের উদ্দেশ্যে সভাপতি আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী, সমাজের সকল ভাল কাজে এবং অসহায় গরীব দুঃস্থ মানুষের সহযোগিতা করার জন্য কমিটির সকল সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানান। এদিকে কমিটির উদ্যোগে দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের বিমানুল্যে সেলাই, ব্লক ও বুটিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা চালু করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জেসমিনা খানম, চেয়ারম্যান নারী ঐক্য বাংলাদেশ, নোভা, জান্নাতুল ফেরদৌস সাধারণ সম্পাদক নারী ঐক্য বাংলাদেশ, সেলিনা আকতার সদস্য ও কমিটির সহ-সভাপতি শুরা মিয়াসহ সকল সদস্যবৃন্দ। এতে ৪০ জন মহিলা শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রথম ব্যাজ চালু করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপদেষ্টারা বলেন, সমাজের বেকারত্ব দূরীকরণ ও মানুষকে স্বর্ণিভর করার জন্য মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ আজিমপুর শাখার উদ্যোগে এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেখানে সকলে এসে বিনামূল্যে এ হস্ত কর্ম প্রশিক্ষণ নিয়ে বেকারত্ব দূরীকরণ করা তথা স্বর্ণিভর হওয়ার আহ্বান জানান।

দুবাই মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালিত

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ মাইজাভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি দুবাই শাখার উদ্যোগে কমিটির সভাপতি সাইফুদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্থানীয় সেরা দুবাই মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থার হলরুমে যথাযথ মর্যাদায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উদ্‌যাপন করা হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ধর্ম সম্পাদক মোঃ জানে আলম ফারুকী, নাতে রাসুল (দঃ) পাঠ করেন সৈয়দ ফোরকান ও বাকের, গজলে মাইজভাণ্ডারী পরিবেশন করেন মোঃ ওসমান। ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) এর তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম, কাজী মাহমুদ আলী, মোঃ হারুন, হক কমিটি আল আইন শাখার সাধারণ সম্পাদক হাবীব উল্লাহ। সভায় উপস্থিত ছিলেন আল আবির শাখার সভাপতি শফিউল আলম, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার উদ্দীন, উপদেষ্টা কামাল উদ্দীন, আনসারুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন অত্র কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক এম. আবুল মনছুর। পরিশেষে আজমান শাখার উপদেষ্টা আলহাজ্ব মৌলানা দিদারুল আলমের পরিচালনায় তকরীর, মিলাদ, কেয়াম ও তাওয়াল্লুদে পাউসিয়া পাঠের মাধ্যমে আখেরী মোনাজাত এবং সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা ও সকলের মাঝে তবরুক বিতরণ করা হয়।

হযরত পানি শাহ্ (কঃ) এর ওরশ শরীফ

গত ১৯ মার্চ '১২ হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফি সৈয়দ আমিনুল হক পানি শাহ্ (কঃ)'র ৫৫ তম বার্ষিক ওরশ শরীফ যথাযোগ্য মর্যাদায় ধলই গাউসিয়া আমিন মনজিলে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দিনব্যাপী খতমে কুরআন, খতমে গাউসিয়া আলীয়া ও রাত ১২ টায় দেশ ওজতির কল্যাণ কামনায় আখেরী মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন সাজ্জাদানশীন শাহ্‌সূফি সৈয়দ মোহাম্মদ ইলিয়াছ জাবেদ শাহ্ (মঃজিঃআঃ)

শোকপ্রকাশ

লায়ন মীর রমজান আলীঃ বিশিষ্ট সমাজসেবক, মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠির সহ-সভাপতি ও মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ মাঝিরঘাট শাখার সহ-সভাপতি লায়ন মীর রমজান আলী ৪ মার্চ '১২ মধ্যরাতে ঢাকার একটি ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিলাহে ------- রাজেউন)। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাঃজিঃআঃ), কেন্দ্রীয় পরিষদ, মাইজভাণ্ডারী একাডেমী, মহানগর গাউসিয়া হক কমিটি, মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠি, হামজারবাগ গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরীফ -এর কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ। এদিকে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ মাঝিরঘাট শাখার উদ্যোগে গত ২২ মার্চ সদরঘাট পুরাতন কাস্টমস্থ হযরত অবদুর রহমান রুমি শাহ (রহ্) মাজার প্রাঙ্গণে বাদে আছর মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

মুহাম্মদ সফি ভাণ্ডারীঃ গত ১৮ মার্চ '১২ রবিবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর একনিষ্ঠ ভক্ত মুহাম্মদ সফি ভাণ্ডারী (৬২) ইন্তিকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ------- রাজিউন)। তিনি ১ ছেলে ৮ মেয়ে সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান।

আবদুস সোবহানঃ গত ৪ মার্চ '১২ রবিবার রাত ১২ ঘটিকার সময় বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর একনিষ্ঠ আশেক আবদুস সোবহান (৬৫) ইন্তিকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ------- রাজিউন)।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্‌স্টিটিউটে মাইজভান্ডারী একাডেমীর দুই দিন ব্যাপী ৩য় আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলন ৯ ও ১০ মার্চ ২০১২ এর ছবি ঃ

বিজি-এমইএ ভবনে গোল টেবিল বৈঠকে দেশ-বিদেশের আমন্ত্রিত অতিথিদের দেখা যাচ্ছে।

৩য় আন্তর্জাতিক সূফি সম্মেলনে প্রথম দিনের দেশ-বিদেশের অতিথি ও আলোচকবৃন্দদের দেখা যাচ্ছে।

মোনাজাত করছেন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভান্ডারী

মাইজভান্ডারী গান পরিবেশন করছেন আমিনুল ইসলাম কাওয়াল।

সমাপনী দিনে দেশ-বিদেশের অতিথি ও আলোচকদের দেখা যাচ্ছে।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

স্থাপত্য প্রকল্প :

১. শাপলা নক্শা শোভিত রওজা শরীফ।
২. বাব-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী তোরণ (নাজিরহাট দরবার গেইট)।

শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প :

১. মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী।
২. উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম হেফজখানা ও এতিমখানা।
৩. শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) বৃত্তি তহবিল।
৪. মাইজভাণ্ডার শরীফ গণপাঠাগার।
৫. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি।
৬. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি।
৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া।
৮. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী এবতেদায়ী কে. জি. মাদ্রাসা, পশ্চিম গোমদণ্ডী, বোয়ালখালী।
৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী।
১০. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী।
১১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, চন্দনাইশ (সদর)।
১২. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী স্কুল, পশ্চিম ইঁদগাঁও রাঙ্গুনিয়া।
১৩. মাদ্রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী এবতেদায়ী ও হেফজখানা, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম।
১৪. মাদ্রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৫. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, এয়াকুবদণ্ডী পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. মাদ্রাসা-এ-বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হেফজখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী
১৭. জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও এবাদতখানা, চরখিজিরপুর (টেক্কাঘর) বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প :

১. হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :

১. মূলধারা সমাজকল্যাণ সমিতি (রেজিঃ নং-চট্টগ্রাম ২৪৬৮/০২)।
২. প্রত্যাশা সঞ্চয় প্রকল্প।
৩. যাকাত তহবিল।
৪. দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প :

১. মাসিক আলোকধারা।
২. মাইজভাণ্ডারী একাডেমী।

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প :

১. মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
২. মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প :

১. নাজিরহাট তেমোহনী রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনী ও এবাদতখানা।
২. শানে আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনী।
৩. ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।